সত্যে এক সময়ে জনসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া ছিল। পুরাণ পাঠে ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও সময় এরূপ প্রশ্নও উঠিয়াছিল যে অসৎকার্য্যে ব্রহ্মাদির যদি কিছু প্রত্যবায় না হয় তবে মনুষ্যের কেন হইবে। কিন্তু গ্রন্থকারেরা বড় চতুর। তাঁহারা লোকস্থিতিভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যুত্তরে কহিয়াছিলেন তেজীয়ানদিগের ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। কোথাও বলিয়াছেন ব্রহ্মাদির ঐরূপ কার্য্য কেবল অসুর-প্রলোভনের নিমিত্ত। অর্থাৎ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অসুরেরা এইরূপ পাপে লিপ্ত হইয়া উচ্ছন্নে যাইবে। কি চমৎকার প্রত্যুত্তর।

এখন বুঝা গেল সত্যের ছদ্মবেশ কতদূর দূষণীয়। যদি বল বর্ত্তমান শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষার প্রাদুর্ভাব। এখন ইওরোপ ও ভারতবর্ষ জ্ঞানে এক হইয়াছে। সুতরাং কোন রূপ ছদ্মবেশ সত্যকে লোকের চক্ষে আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। এ কথাও ঠিক নহে। ভারতবর্ষে কেবল এখনই যে উচ্চ-শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ইহা কে বলিল। এখানে এমন একটী সময় ছিল যে, পৃথিবীর আর কোন দেশ এপর্য্যন্তও তাহার সীমায় যাইতে পারে নাই। আমরা সেই কালের উল্লেখ করিয়া বলিতেছি যে তখনও এই প্রচ্ছন্ন সত্যের অনুসন্ধান অনেকেই পান নাই। উপরে যে বৌদ্ধবিবাদের কথা তুলিয়াছি উহা দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণ হয়। যখন গ্রন্থ-বিশেষ জ্ঞানের প্রমাপক না হইয়া বুদ্ধি ও হৃদয় তাহার প্রমাপক হয় সে সময়কে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষার কাল বলিব। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে। আর মনুর ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়-স্থল পাঠ করিলেও তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে সময়েও যখন অনেকেরই চক্ষে সত্যের এই ছদ্মবেশ ধরা পড়ে নাই এবং মীমাংসকদিগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হইলেও যখন আবহমান কাল ভ্রান্তিটাই চলিয়া আসিয়াছে তখন মুক্তকণ্ঠে বলা যায় সত্যের অঙ্গে অলঙ্কার বড় দূষণীয়।

এই সালঙ্কার সত্যের জন্ম আলোকে কিন্তু ইহার কর্ম্ম ঘোর অন্ধকারে। সত্যের রূপে মুগ্ধ না হইলে তাহাকে সাজাইতে প্রবৃত্তি হয় না। এই মোহের মূল আলোক। আবার আমি যেমন মুগ্ধ হইলাম এইরূপ অন্যেও হউক এই জন্য তাহার সাজ-সজ্জা। ফলত সত্যের এই বাহ্য সম্পদের যাহারা স্রষ্টা বাহ্য সম্পদ তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু মুগ্ধ করে পরবর্ত্তী-দিগকে, তাহাও আবার অন্ধকারে। ঋষিরা কহিয়াছেন কেবল সাধকদিগের হিতের নিমিত্তই বাহ্য সজ্জার এইরূপ কল্পনা জানিবে। কিন্তু পরবর্ত্তীরা অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে কল্পনার কথা বিস্মৃত হন এবং অলঙ্কারকেই একটা বাস্তব সত্তা দিয়া থাকেন। এই যে আলঙ্কারিক মোহ এই টুকু অন্ধকার না হইলে স্ফূর্ত্তি পায় না। অনেক সময় এই মোহই আবার অন্ধকারের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, স্বাধীন বুদ্ধি তত্ত্বের অনুসরণ করে ইহাই তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু তত্ত্বের উজ্জ্বল আবরণ যখন একটা আপ্ত বাক্যের সহিত তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় তখন বুদ্ধির আর স্বাধীনতা থাকে না। সে তদ্দণ্ডেই নির্ব্বিচারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আলঙ্কারিক মোহই অন্ধকারের স্রষ্টা। ভারতবর্ষে দেবতত্ত্বে বিশ্বাস এই মোহ-প্রভাবেই ঘটিয়াছিল।

এখন শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয় দেখুন তিনি আধ্যাত্মিক রূপক দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণকে ঈশ্বর ও রাধাকে সাধক নাম দিয়া একটী যে নূতন ধরণের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহার

কত দূর অনিষ্টকারিতা। এই যে আধ্যাত্মিক রূপক ইহা কিছু নূতন নহে। গোপিকা সকল সাধক ও কৃষ্ণ ঈশ্বর এই রূপকের উল্লেদ ভাগবতের কোন কোন বৈষ্ণব টীকাকার করিয়া গিয়াছেন। আর যিনি ঈশ্বরপ্রেমে এক সময় সমস্ত ভারতবর্ষ মাতাইয়া যান সেই ধর্ম্মবীর চৈতন্য যে ঐ নন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধরকে প্রকৃত ঈশ্বর জানিতেন তাহা নহে। তিনিও একটী আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যই হউন আর যেই হউন তাঁহারা যে আলোকে এই সালঙ্কার সত্য পাইয়াছেন ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, হইতেও পারে না। কারণ রূপকর্ত্তা তাঁহারাই গড়িতেছেন এবং তাঁহারাই ভাঙিতেছেন। প্রকৃত সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, সুতরাং এই বাহ্য সজ্জা তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেই চৈতন্যের পর কয়জন লোক রাধাকৃষ্ণের এই আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে? একে তো ঈশ্বরের কোন নাম নাই, তবে যে নাম দেওয়া তাহা কেবল ভাষার সাহায্য ব্যতীত ভাব প্রকাশ হয় না এই জন্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে নামের সহিত কতকগুলি পার্থিব বিলাসের বা লীলার ভাব জড়িত তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেও তুমি তাহা লইতে পার না। তুমি অবশ্য কৃষ্ণকে ঈশ্বরের ও রাধাকে ভক্তের একটী ভূমিকা পরিগ্রহ করাইয়া উভয়কে নায়ক নায়িকা রূপে দেখাইলে এবং উহাঁদের বিরহ ও মিলনের সঙ্গীতও তাল মানের সহিত গান করিলে, কিন্তু ইহার ফল কি হইল? জনসমাজের তিন ভাগ অজ্ঞ ও এক ভাগ বিজ্ঞ। যদিও বিজ্ঞেরা যবনিকার অন্তরাল দিয়া কৃষ্ণ ও রাধা কাহার ভূমিকা লইয়াছেন ইহা দেখিতে পান কিন্তু অজ্ঞেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও পায় না। শ্রীমতী রাধা মানিনী, শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছখচিত বনমালাজড়িত মস্তক তাঁহার চরণের নখররাগে রঞ্জিত হইয়া জগতে কি যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করিতেছে সে তাহার কিছুই বুঝে না। ফলে দাঁড়াইল মর্ত্তারূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মর্ত্ত্যরূপী ঈশ্বরের নানা রূপ মর্ত্ত্য লীলায় বিশ্বাস। ভাগবতের ন্যায় ভক্তিদর্শন জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। সেই ভাগবতকার অন্যান্য বৈষ্ণব কবির ন্যায় কৃষ্ণের মর্ত্ত্য লীলা বর্ণনে লেখনীকে তাদৃশ প্রশ্রয় দেন নাই। তথাচ তিনি শুকমুখে সংশয় করিয়াছিলেন যে তিনি জগতকে যে প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিতে চলিয়াছেন কৃষ্ণের এই মর্ত্ত্য লীলা তাহার ব্যাঘাতক হইবে কি না। ফলত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহার আলোচনা করিলে তাঁহার এই সংশয় সঙ্গতই বোধ হয়। ইহাদের অনেক গুলি জীবন্ত কৃষ্ণলীলা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ। ফলত এই ভারতবর্ষে কোন সম্প্রদায় দ্বারা যদি কোনও দূষিত কার্য্য হইয়া থাকে তবে তাহা এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারা হইয়াছে। ইহার কারণ নায়ক নায়িকা ভাবে যুগল মূর্ত্তির কল্পনা। কেবল এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেন এই ছদ্মবেশী সত্য দ্বারা আর একটী সম্প্রদায়ের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা এতদ্দেশের প্রবল তান্ত্রিক সম্প্রদায়। বাহ্য দৃশ্যে তন্ত্র অবশ্যই একটী জঘন্য কাণ্ড। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থল উজ্জ্বল সত্যে পরিপূর্ণ। অজ্ঞ লোকে আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারে না। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের মধ্যে মদ্যপান ব্যভিচার প্রভৃতি ঘোরতর পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে। ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে এই তন্ত্রোক্ত সাধনার দোহাই দিয়া অনেকে দিবালোকে সর্ব্ব সমক্ষে নানারূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। এই জন্যই বলিয়াছি সত্যের অঙ্গে অলঙ্কার জনসমাজের সর্ব্বনাশের মূল। লোকে অগ্রে অলঙ্কারের প্রভায় মুগ্ধ হয়, অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধানে তাহারা আর অবসর পায় না।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত উপধর্ম্মের হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ইহার বীজমন্ত্র নিরলঙ্কার ওঁকার। এই ওঁকার সাধনাই ব্রাহ্মের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি এতদ্ব্যতীত গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় অন্য বীজের পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয় উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিবেন।

এই উপধর্ম্মের বলে ভারতের সত্যধর্ম্ম মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তোমরা কুমারিল্ল ভট্ট ও শঙ্করের ন্যায় সেই সমস্ত অলঙ্কার চূর্ণ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সত্যটুকু লোককে বুঝাইয়া দেও ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। গ্রীক প্রভৃতি জাতির পৌত্তলিকতার ন্যায় এই হিন্দুধর্ম্মে যে প্রকৃত পৌত্তলিকতা নাই, প্রত্যুত ইহার অস্থিমজ্জায় যে একেশ্বরবাদ ওতপ্রোত, শব্দ ও অর্থের আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখাইবার চেষ্টা কর, ইহা দ্বারা এই জ্ঞানোজ্জ্বল কালে এই ধর্ম্মকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু বিনয়ের সহিত কহিতেছি সত্যের অলঙ্কার পুনঃপ্রচারের কিছুতেই চেষ্টা পাইও না। কারণ এই অলঙ্কারের জন্ম আলোকে কিন্তু স্ফূর্ত্তি অন্ধকারে। স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় সূক্ষ্মের আনন্দ লোপ করিয়া ক্রমশ স্থূলের আনন্দ আনয়ন করা ইহার গূঢ় শক্তি। এই জন্যই ইহাকে অন্ধকারের স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব সাবধান ভারতের বক্ষে সেই অন্ধকার আর আনিও না। ইহাতে তোমার অনিষ্ট আমার অনিষ্ট এবং সমস্ত দেশের অনিষ্ট।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ইহাতে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ খৃষ্টীয় সমাজ মুসলমান সমাজ; আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই অথচ সকল সম্প্রদায় আমার। যেখানে যত টুকু সত্য, সেই টুকু আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এখন হইতে এই সার সত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। আমার মতের আভাস নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ আনন্দ শান্তি মঙ্গল স্বরূপ, অজর অমর নিত্য, এক মাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র স্বরূপ।

তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা কোন সৃষ্ট বস্তুর মত তিনি নহেন, তিনি স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তিন জনও নাই অথবা অনেক ঈশ্বর নাই।

যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই ঈশ্বর কোথা হইতে অন্য ঈশ্বর আসিবেন।

পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটী নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে।

সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। একথাও ঠিক নহে। কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং পাপহরণকর্ত্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত গুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়া গদ গদ ভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশু গুলাকে ডাকিয়া কান্দিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমার উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য নহে। আমার দেবতা অন্তর্যামী তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞান চক্ষু আছে সেইরূপ, জ্ঞান কর্ণ, জ্ঞান নাসিকা, জ্ঞান রসনা ইত্যাদি আছে। যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহলোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হয়। যাহার শরীর আত্মা নির্ম্মল তাহার আপন। আপনি জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে। অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য ধর্ম্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দলাদলীর সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিলে তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়।

আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভাল বাসি তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভাল বাসেন তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন তিনিই আমার পরমাত্মীয় পরমবন্ধু। এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয় সেই স্থানেই গমন করি, যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন সেই স্থানেই

উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, আমার প্রভুর নামকীর্ত্তন করিতেছে; কত আনন্দ, আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত শৈব বৈষ্ণব খৃষ্টান মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষ-তলে কত পর্ব্বতে নদীগর্ভে দেবমন্দিরে মসজিদ্ গির্জ্জায় আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটী উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চছবি আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক কবীর ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক, প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনাকালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, গ্রহ উপগ্রহ কীট পতঙ্গ মনুষ্য সকলের মধ্যদিয়া সেই জগৎগুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই সে বস্তুকেই ভাল বাসি ভক্তি করি। পিতা মাতা উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন। তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কি তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্ত্তিরূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি লাভ হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারী মাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয় না।

পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান প্রেম শক্তি রূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান প্রেম শক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্য দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। তখন ঈশ্বর পরলোক কল্পনার বস্তু থাকেন না, প্রত্যক্ষ হন। ইহাকেই করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

কলিকাতা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার নিবাস ৩১ শে বৈশাখ। ১৮২৬ শক

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ
গোস্বামী

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

ঊনবিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত মাঘ মাসের পত্রিকার ২০৭ পৃষ্ঠার পর।)

হৃদয়ের পতি যিনি হৃদয়-ঈশ্বর।
তাঁরে যদি পাও জীব! হৃদয় ভিতর।
তবে কেন অন্য ভক্ত, তাঁহার প্রেমেতে মত্ত,
প্রেম ভক্তি ভরে তাঁরে পূজ নিরন্তর॥

স্বাধীন করিয়া তিনি সৃজেন আত্মায়।
করিবে তাঁহার পূজা আপন ইচ্ছায়।
আপনারে তেয়াগিবে, তাঁরে মন প্রাণ দিবে,
প্রেম-পথে নাহি যাবে সংসার মায়ায়॥

স্বাধীনতা আমাদের হয়ত ভূষণ।
আমাদের ছাড় দেখ নিখিল ভুবন।
সুধাংশু তপন তারা, স্বাধীন নহেক তারা,
তাঁর অনুগত হয়ে করিছে ভ্রমণ॥

ঋতু সবে তাঁর বশে উদিছে ফিরিছে।
মেঘ বৃষ্টি করে দান, পবন বহিছে।
গিরি হ'তে প্রস্রবণ, বহে নদ নদীগণ,
বসুন্ধরা ফল ফুল শস্য প্রসবিছে॥

কিন্তু হায় মানবেরা তাঁর বশে নয়!
তাঁর ধর্ম্ম সেতু ভাঙ্গি করিছে প্রলয়!
বিবেকেরে পদে দলি, প্রবৃত্তির পথে চলি,
আপনাতে মলিনতা করিছে সঞ্চয়॥

স্বাধীনতা পেয়ে নর হ'ল উচ্ছৃঙ্খল।
স্বাধীনতা বুকে কিবা [illegible]!
তাঁহা হ'তে দূরে রয়, বিষম দুর্গতি হয়,
অমৃত ভ্রমেতে পান করে হলাহল।

কেন বিভু করিলেন স্বাধীন এ নরে?
তাইত আপন ইচ্ছা বিপথে বিচরে।
তাই ক্রোধ অভিমান, হিংসা দ্বেষ ভেদ-জ্ঞান,
সুন্দর ধরারে কিবা ছার খার করে॥

কে [illegible] দেন স্বাধীনতা মঙ্গল-নিদান?
স্বাধীনতা—চরিত্রের নিকষ পাষাণ।
যেবা তাঁর ভক্ত হ'বে, তাঁর পথ বাছি ল'বে,
সেই পথে করিবেক, একান্তে প্রয়াণ॥

হৃদি কাম-জটা-পাশ করিবে ছেদন।
তাঁর প্রেমে মজিবেক তাহার জীবন।
যত কিছু অভিলাষ, অন্য প্রেম অন্য আশ,
সে প্রেম অধীন হয়ে করিবে ধারণ॥

স্বাধীনতা দিয়া তিনি বিচ্ছেদ ঘটান।
সে বিচ্ছেদ মিলনের হয় আগুয়ান।
সে বিচ্ছেদে কত নর, পুড়ি হয়ে জর জর,
তাঁহার কাছেতে গিয়া জুড়ায় পরাণ॥

স্বাধীনতা—আমাদের নিজস্ব জানায়।
দেখি—দেহ ধন প্রাণ প্রেম সমুদায়।
হয় সব আপনার, ইথে মম অধিকার,
যারে ভাল বাসি আমি সব দিব তায়॥

সে প্রেম ভাতিলে এবে তাঁহার কৃপায়।
তাঁহারে সকল দিতে কিবা প্রাণ চায়।
বলি তাঁরে "দয়াময়!" কত যে তোমার হয়,
করুণা অধম জনে বলা নাহি যায়।

মোহের স্বপন তুমি আমার ভাঙ্গিলে।
এ হেন পাপীরে তুমি উদ্ধার করিলে।
তুমি মোর মুক্তি গতি, তোমাতে করিতে মতি,
তোমার শরণ ল'তে তুমিই বলিলে॥

তব পথে চলে সদা তারকা তপন।
আমি যেন চলি তাহে তাদের মতন।
ওহে হৃদয়ের স্বামী, স্বাধীন না র'ব আমি,
হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি করহে গ্রহণ॥"

স্বাধীনতা—দেখ কিবা উচ্চ অধিকার।
যার বলে দিই তাঁরে যা আছে আমার।
তাঁহার অধীন হই, তাঁহার শরণ লই,
তাঁহার আদেশ হৃদি পালি অনিবার।

নিয়তি অধীন হয় জড় সমুদয়।
জড়ের নিয়মে বদ্ধ আত্মা কভু নয়।
আপন মঙ্গল আত্মা কিবা চিনে লয়।
পবিত্র হইতে তার ইচ্ছা অতিশয়॥
আপন সম্বন্ধ বুঝে ঈশ্বরের সনে।
তাঁহাতে সংযুক্ত হয় প্রেমের বন্ধনে॥
যে দেব ভাবেতে আত্মা তাঁর পথে চলে।
যাহার প্রভাবে আত্মা তাঁর প্রেমে গলে॥
সেই দেব-ভাব তার হয় নিজ ধন।
বিনাশিতে তাহা নাহি পারে কোন জন॥
জগতের যত শক্তি আছে বিদ্যমান।
সব হ'তে আত্ম-শক্তি হয় বলীয়ান।
যবে আত্মা নিজ বলে ধায় তাঁর পানে।
বাধা বিঘ্ন পথে তার কভু নাহি মানে॥
শত শত প্রলোভনে থাকে সে অটল।
তিরস্কার লাঞ্ছনায় বাড়ে তার বল॥
এই তার স্বাধীনতা—ঈশ্বর অধীন।
থাকিয়া তাঁহার কায করে অনুদিন॥

জড় জগতের যন্ত্রী হয়েন ঈশ্বর।
তাঁহার নিয়মে রহে যত চরাচর॥
সবার আশ্রয় সেই পরম কারণ।
আশ্রয় অধিক তিনি আমাদের হ'ন॥
পিতা তিনি—পুত্র মোরা সবে হই তাই।
প্রেম ভক্তি করি তাঁরে—তাঁর কাছে যাই॥
আমরা রয়েছি তাঁর নিকটে যেমন।
জড় রাজ্য তাঁর কাছে হয় কি তেমন?
প্রেম পবিত্রতা যত করিব অর্জ্জন।
ততই নিকটে তাঁর করিব গমন॥
আমরা অনন্তকাল তাঁর কাছে যা'ব।
তাঁহার মঙ্গল ছায়া চিরকাল পা'ব॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! স্বাধীন, করিলে আমায়,
চাহি আমি তব হই।
দেহ মনঃ প্রাণ সঁপিয়া তোমারে,
তোমার শরণ লই॥
চাহি তোমা ছাড়ি, সুদূরে পড়িয়া
বিষয়ে মগন হয়ে।
অমূল্য জীবন, করি বিসর্জ্জন,
ধন মান বৃথা লয়ে॥

করিলে স্বাধীন—এবে এই চাই,
নয়নে নয়নে রাখ।
তোমার শরণ, লইলাম হৃদি,
সতত নিকটে থাক॥
তুমি পিতা মাতা, সহায় ভরসা,
ওহে নাথ! কৃপা করি।
তরঙ্গ ভীষণ, অকূল পাথারে,
দেহ মোরে পদ তরী॥
তোমার সুন্দর প্রসন্ন আনন,
দেখাও অধীন জনে।
তব ইচ্ছা যাহা, হোক ইচ্ছা মম,
পালি তাহা প্রাণ পণে॥
পবিত্র করহ, অন্তর আমার,
প্রেম সুধা তব দানে।
বিপদ সম্পদে, থাকে যেন চিত্ত,
নিয়ত তোমার পানে॥
ইতি ঊনবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

সংবাদ।

আমরা শোকাকুল চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বহুকাল রোগভোগের পর গত ৯ জ্যৈষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায় এক প্রকার নষ্ট হয়। ফলত বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের বিষয় সকল এই পত্রি-কায় প্রকাশ করিয়া তিনি জনসমাজের যথেষ্ট উপ-কার করিয়া যান। তাঁহার অনেক পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ। কি ভাষা কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। এই ধীমানের মৃত্যু-সংবাদে অনেকেই যে দুঃখিত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আগামী ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৮০৮ শক।

"যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

যিনি মহান্ তিনি সুখ-স্বরূপ অল্প কিছুতে সুখ নাই। অন্তবৎ বিষয় সমূহের সঙ্গে আমাদের ক্ষণিক সম্বন্ধ, অনন্ত পরব্রহ্মের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ। আমাদের জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলেই আমরা অনন্ত ভূমা মহান্ পুরুষকে আমাদের আত্মাতে দেখিতে পাই, তখন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে প্রেমের উৎস আপনা হইতেই উৎসারিত হইয়া উঠে। ভূমা মহান্ পুরুষ আমাদের আত্মার একমাত্র শান্তি-নিকেতন। যে পর্য্যন্ত না আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে পাই সে পর্য্যন্ত আমাদের ব্যাকুলতা কিছুতেই শান্তি মানিতে পারে না। তিনি মহান্—দেবতাদিগের অধিপতি—ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষের অধীশ্বর, তথাপি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের বিরাম নাই। সংসারের ধন্দে পথ ভুলিয়া যখন আমরা তাঁহা হইতে বিমুখ হই তখন তাঁহার করুণা এক নিমেষের জন্যও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না; যখন মোহের অন্ধকারে আমাদের গতিরোধ হইয়া যায়, তখন তাঁহারই সেই করুণা জ্ঞানের আলোক ধরিয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে। ঘোরা রজনীর অবসানে অরুণ-ছটা আবির্ভূত হইয়া যেমন পৃথিবীকে আশ্বাস-যুক্ত করে, তাঁহার করুণা সেইরূপ আমাদের সম্মুখে আসিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করে। এমন অবিচলিত প্রেম আমাদের সঙ্গের সঙ্গী—ইহার কণামাত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কি আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইব না? এমন সর্ব্ব-সন্তাপহারী চিরন্তন প্রেম আর কোথায় আমরা অন্বেষণ করিয়া পাইব? পরমাত্মা অনন্ত মহান্—তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, প্রাসাদে বর্ত্তমান—কুটীরে বর্ত্তমান, স্বর্গে বর্ত্তমান—মর্ত্ত্যে বর্ত্তমান; অন্তবৎ বিষয়-রাজ্য হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইলেই আমরা তাঁহার অভয় প্রেমমূর্ত্তি দেখিতে পাইব—তাঁহার অমৃতময় সত্তা এই খানেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইব। আকাশকে আমরা কথায় বলি অসীম মহান্ কিন্তু সেই আকাশের প্রত্যেক বিন্দু যাঁহার অনন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ তিনিই প্রকৃত অসীম, প্রকৃত মহান্। দেশ কালে আ-

বদ্ধ আমাদের এই আত্মাকে আমরা বলি স্বাধীন পুরুষ,কিন্তু সেই আত্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই সনাতন স্বাধীন পুরুষ; তাঁহার চেতন-প্রসাদেই আমাদের আত্মা সচেতন হইয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতা-প্রসাদেই আমাদের আত্মা স্বাধীন হইয়াছে; স্বাধীন হইয়া তাঁহার সহিত সহবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। পরমাত্মার প্রতি আত্মার যে প্রীতি, তাহা বলের বশীভূত নহে—তাহা স্বাধীনতারই উচ্ছ্বাস। পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানে চির প্রকাশমান, তিনি আমাদের হৃদয়ে চির বিরাজমান,—কিন্তু এ বার্ত্তাটি আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না; তখনই উহা আমরা বুঝিতে পারি—যখন আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, হৃদয় কলুষ-গ্লানি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্র আনন্দের আবাস হয়—এক কথায় যখন আমাদের আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে আত্মাতে পরমাত্মাতে কিসের আর ব্যবধান। পরমাত্মা অসীম জগতের ব্যবধান ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন—আমরা কেবল মোহের ব্যবধান ভেদ করিলেই তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তবে কেন আমরা তাহাতে আলস্য করি? সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে আইস আমরা স্থির চিত্তে ধ্যান করি—ধ্যানের সংকীর্ণ নদী বেগবতী হইয়া যখন আনন্দের অতল-স্পর্শ সমুদ্রে বিলীন হইবে, তখন আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। মনুষ্য হইয়া আমরা যদি পরমাত্মাকে না জানিলাম ও তাঁহার সহবাস-গুণে জ্ঞানময় ও প্রেমময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত না হইলাম, জড়ময় হইয়াই জীবন অতিবাহন করিলাম, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বে প্রয়োজন কি ছিল? জ্ঞানের মূল্য কি জড় অপেক্ষা অধিক নহে—প্রেমের মূল্য কি মোহ অপেক্ষা অধিক নহে? জড়ের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া আমরা কি জ্ঞানকে জলে নিক্ষেপ করিব? মোহের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া আমরা কি প্রেমকে জলে নিক্ষেপ করিব? স্বর্গীয় জ্ঞান-প্রেম কি ইহারই জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, কেবল জড় ও মোহের দাসত্ব করিয়াই জীবন অবসান করিবে? কখনই না। স্বর্গীয় জ্ঞান কি পৃথিবীর ধূলিকে তিলক করিয়া ললাটে ধারণ করিবে? পবিত্র প্রেম কি পঙ্কিল বাসনাকে অঙ্গের ভূষণ করিবে? তাহা যদি করে, তবে সে জ্ঞানকে ধিক্—সে প্রেমকে ধিক্! জ্ঞানের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, প্রেমের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" অতএব আইস আমরা মোহময় সংসারের মরীচিকা পশ্চাতে ফেলিয়া জ্ঞান-প্রেমের ভূমা অমৃত-সাগরে আত্মাকে নিমগ্ন করিয়া জীবন সার্থক করি।

হে পরমাত্মন্! আমরা সুবিমল শান্তির জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি; আর যে-দিকে আমরা দৃষ্টি করি, সেই দিকেই তুমুল তরঙ্গ কোলাহল মুখ ব্যাদান করিয়া উঠিতেছে, কোথায় যাইব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমাদের দেশ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ-মস্তক প্রপীড়িত, আমাদের অন্তঃকরণ কঠিনতর পরাধীনতায় ম্রিয়মাণ; কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে ক্ষণকালের জন্য নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি-সুখ অনুভব করি। আমাদের আর সকল দিক্ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তোমার প্রেম-মুখ আমাদের তৃষিত আত্মার সমক্ষে অনাবৃত কর—তাহা হইলে আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশের কত নব্য সন্তান স্বাধীনতার মুখ দর্শন করিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন

করে; হায়! স্বাধীনতার নিজ নিকেতন—মুক্তির অনিরুদ্ধ আকাশ যে তুমি—তোমাকেই আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি—আমাদের আর কি হইবে! আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে—স্বাধীনতা আমাদের নিকটতম প্রদেশে শত সহস্র রশ্মিতে দীপ্তি পাইলেও আমাদের কাছে তাহা তামসী নিশার অন্ধকার! তোমার প্রেমের বীজ আমারদের আত্মাতে অঙ্কুরিত হইলে তাহা হইতেই কেবল স্বাধীনতা ফলিতে পারে ইহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। তোমার প্রেম যদি এই দণ্ডে আমাদের আত্মাতে বলের সঞ্চার করে তবে এই দণ্ডেই আমরা স্বাধীন হই। তাহা হইলে পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে দেখিয়া চমকিত হয়—বাহুবল ও মোহবল অপেক্ষা আত্মার বল কত প্রতাপশালী। কিন্তু এখন আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া দিনপাত করিতেছি—এখন আমাদের কোনো বলই নাই;—দীন হীন গতিহীনের তুমি করুণাময় প্রভু—এই কেবল আমাদের এক মাত্র ভরসা,—তুমি আমাদের প্রতি তোমার এক বিন্দু কৃপা বিতরণ কর এই কেবল আমাদের প্রার্থনা; তোমার প্রসন্নতাই আমাদের দুর্ব্বল আত্মাতে বলাধান করিতে পারে—তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দর্শন-সংহিতা।*

ক্ষুদ্র একটি আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন।

এই তন্ত্রটির বিরুদ্ধে যৎসামান্য এই একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উহার ঐ প্রবল প্রমাণ-পদ্ধতিটি গণিত-বিজ্ঞানের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া,—তাহা গণিত বিজ্ঞানকেই সাজে, তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে তাহা সংলগ্ন হয় না। ইহার উত্তর এই—সংলগ্ন হয় কি না তাহা কেবল "ফলেন পরিচীয়তে" ফল দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। পরীক্ষাতে যদি এইরূপ দাঁড়ায় যে, ঐ প্রকার প্রবল প্রমাণ-পদ্ধতি তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে দিব্য উপযোগী, তবে তাহার উপর আর কথা নাই; আর, পরীক্ষায় যদি তাহা না টেঁকে, তবে তাহার সপক্ষে তর্ক করা-ও যেমন নিষ্ফল, তাহার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা-ও তেমনি নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি এমনি যে, তাহার আপনার যোগ্যতা-সমর্থন আপনাকেই করিতে হইবে,—ফালাও তর্কবিতর্ক-দ্বারা নহে কিন্তু কার্য্য-দ্বারা। তবে, লোকে এই যে একটা কথা রাষ্ট্র যে, ঐ প্রবল প্রমাণ পদ্ধতিটি তত্ত্বজ্ঞানের নিজের নহে—উহা গণিতের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া—এ কথা কাজের কথা নহে; উল্টা বরং এই

---

* গত মাসের পত্রিকায় দর্শন-সংহিতার উপক্রমণিকার একটি পরিচ্ছেদ ভুল-ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে; সেটি "প্রতিপক্ষের স্ববিঘাত অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন" এই শিরস্ক পরিচ্ছেদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী; সেই পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

সদ্য-প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন নহে।

এখানে আর-একটি বিষয় বলিবার আছে,—বিষয়টি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু গুরুতর; সে-টি এই যে, সদ্য-প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন নহে—যদিচ অনেকেরই সেইরূপ বিশ্বাস। গ্রন্থের মুখ্য-অবয়বে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করা হইবে যে, আমাদের সমস্ত স্বাভাবিক চিন্তা ধারাবাহিক ভ্রম-সিদ্ধান্ত-পরম্পরায় পর্য্যবসিত; সে সিদ্ধান্ত-গুলির প্রত্যেকেই স্ববিঘাত-গর্ভ, অথবা যাহা একই কথা—একটি-না-একটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী। কিন্তু তা'বলিয়া এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, সে সব ভ্রম-সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হইবা-মাত্র অমনি তাহাদের স্বব্যাহতি-দোষ জাজ্বল্য হইয়া উঠিবে, অথবা জ্ঞানের যে-সকল প্রকৃত তত্ত্ব তাহাদের স্থানে বসিবার উপযুক্ত সেগুলি তদণ্ডেই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্ঞানের অনুজ্ঞা পাইতে—আগন্তুক সত্য-সকলের যত না সময় ও সাধ্য-সাধনা আবশ্যক হয়—উচ্চ অঙ্গের অবশ্যম্ভাবী সত্য-গুলির তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় ও সাধ্য-সাধনা অপেক্ষিত হয়।

কথাই ঠিক্ যে, তত্ত্বজ্ঞানের তুলনায় গণিত-বিজ্ঞান যেহেতু অপেক্ষাকৃত অল্প-গভীর সুতরাং আশু বিকাশ-সুলভ, এ-জন্য খুব সম্ভব যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ-পদ্ধতি পাকিয়া উঠিতে না উঠিতেই গণিত-বিজ্ঞান আগে-ভাগে তাহা চুরি করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। নচেৎ, গণিত-বিজ্ঞান মনুষ্য-জ্ঞানের সংকীর্ণ একটি শাখা হইয়া সার্ব্বভৌমিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ-পদ্ধতির সমস্তই একা এক-চেটিয়া করিবে—ইহা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি।

এই তন্ত্রের বৈতর্কিকতা-লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তি দেখিবেন যে, এখানে যে তন্ত্রটি তাঁহার বিবেচনার্থে সমর্পিত হইতেছে, তাহা বৈতর্কিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি মনে করিতে পারেন যে, শুদ্ধ কেবল সত্যের প্রতি এবং আপনার প্রণালী-অনুযায়ী সত্য-প্রদর্শনের প্রতি যাহার একমাত্র লক্ষ্য, আর কিছুরই জন্য যাহার মাথা-ব্যথা নাই, তাহার পক্ষে অতটা বৈতর্কিক হওয়া শোভা পায় না। এ বিষয়টির সম্যক্ তাৎপর্য্য নিম্নে খুলিয়া দেওয়া যাইতেছে; কারণ, ইহার আন্দোলন-গতিকে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যই বা কি আর প্রয়োজনই বা কি তাহা ঠিক্ ঠাক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞানকে বৈতর্কিক হইতে হয়।

এই তন্ত্রটি অতিমাত্র বৈতর্কিক! কেন? না যেহেতু লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধনের জন্যই ইহার জন্ম-পরিগ্রহ। এ ভিন্ন ইহার আর কোন ব্রত নাই, আর কোন উদ্দেশ্য নাই, আর কোন কর্ম্ম নাই। এ যদি হয় যে, মনুষ্য স্বভাবতই তত্ত্বানুযায়ী চিন্তা করে, তবে তাহাকে তত্ত্ব-চিন্তা শিক্ষা দেওয়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্য যদি বিনা-প্রযত্নে পূর্ব্ব হইতেই সত্যে দখল পাইয়া থাকে, তবে তাহাকে সত্যে দখল দেওয়ানো অনাবশ্যক; তাহা হইলে তো তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্ম গিয়াছে—তাহার করিবার-আর কিছুই নাই—তাহার থাকা কেবল বিড়ম্বনা। এ জন্য তত্ত্বজ্ঞান মানিয়া লয় (তাহাকে মানিয়া লইতেই হয়) যে, স্বভাবতঃ মনুষ্য তত্ত্বানুযায়ী চিন্তা করে না, তাহাকে তত্ত্বচিন্তা শিক্ষা দেওয়াইতে হইবে; সত্য আপনা-হইতে মনুষ্যের নিকটে আসে না, সত্যকে সাধ্য-সাধনা করিয়া আনিতে হইবে। স্বভাবতঃ মনুষ্য যদি তত্ত্বানুযায়ী চিন্তা না করে, তবে কি মিথ্যানুযায়ী চিন্তা করে? এতটা আমরা বলি না (কেন না তাহাতে কেবল ছল ধরিবার অভিসন্ধি প্রকাশ পায়) আমরা কেবল বলি যে, স্বভাবতঃ মনুষ্য অনবধানতার সহিত চিন্তা করে; আবার, স্বভাবের গতিকে সত্য যদি মনুষ্যের পৈতৃক সম্পত্তি না হয়, যেমন আর আর অন্নের জন্য মনুষ্যকে পরিশ্রম করিতে হয়—সত্যের জন্যও যদি সেইরূপ করিতে হয়, তবে কি মনুষ্যের স্বাভাবিক পৈতৃক সম্পত্তি মিথ্যা বই আর কিছুই নহে? এ কথাও আমরা বলি না—ছল ধরিয়া নিরপরাধীকে প্যাঁচে ফেলা আমাদের অভিসন্ধি নহে; তাহা যে, একেবারেই মিথ্যা, এ কথা আমরা বলি না, আমরা বলি—তাহা ভ্রান্তি। তবেই হইতেছে যে, অনবধানতা এবং ভ্রান্তি এই দুইটিই জন-সাধারণের পৈতৃক মূল ধন। এই মানিয়া লওয়া সিদ্ধান্তটির উপরে তত্ত্বজ্ঞানের বর্ত্তিবার অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

তত্ত্ববিদ্গণের সাক্ষ্য।

যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোচনায় পৌরুষেয় বাক্যের কোন প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা আমরা এখানে আনিয়া

খাড়া করিলাম, তাহার পোষকতায় প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদাহৃত হইতে পারে; তবে কি না—সে প্রমাণ-গুলি খুব-যে বিশদ ও অস্খলিত তাহা নহে (কেন না তত্ত্বজ্ঞান এ-যাবৎকাল যে-ভাবে চলিয়া আসিতেছে—তাহার কোন্‌খানটাই বা বিশদ কোন্‌খানটাই বা অস্খলিত)। এ-সব প্রমাণ এখন নহে;—যখন আমাদের কথার প্রতিবাদ করা হইবে, যখন আমাদের বিরুদ্ধে দেখানো হইবে যে—মনুষ্যের স্বাভাবিক চিন্তা-সুলভ অনবধানতার সংশোধন ছাড়া আর-কোন উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞানের কোন জন্মে ছিল বা থাকিতে পারে, তখন আমাদের পক্ষের সাক্ষীগণকে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার যথেষ্ট সময় হইবে।

তর্ক বিতর্ক ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

এই যে একটি বৃত্তান্ত যে, লৌকিক চিন্তা-সুলভ অনবধানতার সংশোধনার্থেই তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম-গ্রহণ, এইটি উহাকে উহার স্বেচ্ছাক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—বৈতর্কিক করিয়া তুলিয়াছে। ছিদ্রান্বেষণ-ব্যাপার এড়াইতে পারিলে সে পরম সুখী হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া সে আপনাকে কিছুতেই সামলাইতে পারে না। তাহাকে বৈতর্কিক হইতে হইবে—এই অঙ্গীকার-সূত্রেই তাহার জন্ম-পরিগ্রহ, তাহার জন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিবার জন্যও তাহাকে বৈতর্কিক হইতে হইয়াছে; কারণ, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা-দোষ সে যদি তর্ক দ্বারা খণ্ডন না করিবে, তবে আর কি উপায়ে সে তাহার সংশোধন করিবে?

অবজ্ঞা-দোষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে।

তত্ত্বজ্ঞের বিরুদ্ধে পাছে এই এক অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত সকলকে নিতান্তই হেয় জ্ঞান করেন, এ জন্য এখানে বলা আবশ্যক যে, তত্ত্বজ্ঞ—পরের তত নয় যত আপনার—স্বাভাবিক চিন্তার দোষ ধরেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি আপনাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মুখ্য-রূপে, তিনি আপনারই চিরাভ্যস্ত অনবধানতা-দোষ সংশোধন করিতেছেন। কেবল অন্যেরাও তাঁহার ন্যায় অনবধানতা-গ্রস্ত হইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি গৌণ-রূপে অন্যেরও সেই দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত হ'ন; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে দোষ তিনি অন্য ব্যক্তিতে দেখিতেছেন না—আপনাতেই দেখিতেছেন, এজন্য প্রধানতঃ তাহা তিনি আপনাতেই আরোপ করেন। এ কথাটি এইবার এই যা বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বার ইহার আর উল্লেখ করা হইবে না, অতএব ইহার প্রতি ভাল করিয়া প্রণিধান করা হো'ক্। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীও লৌকিক চিন্তা-সুলভ দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত। যে দোষ তিনি দেখাইতেছেন ও যাহার সংশোধনার্থে তিনি চেষ্টা পাইতেছেন, সে দোষে তিনি যে তাঁহার প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা কম দোষী—তাহা নহে। তাঁহার কলহ তাঁহার প্রতিবেশীদিগের সহিত নহে কিন্তু আপনার সহিত; পাত্রটি এখানে এরূপ যে, তাহাকে (অর্থাৎ আপনাকে) সংশোধন এবং শাসন করিতে মনুষ্যের কেবল যে অধিকার আছে তাহা নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

এই তন্ত্রটি মনোবিজ্ঞানের বিরোধী।

আরো এই দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান তন্ত্র শুদ্ধ যে কেবল লৌকিক চিন্তার বিরোধী তাহা নহে—তাহা মনোবিজ্ঞানেরও অনেকানেক মতের বিরোধী। ইহাও অনিবার্য্য। লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সিদ্ধান্ত সকলের সংশোধনার্থে চেষ্টা না করিয়া মনোবিজ্ঞান

উল্টা আরো সেই ভ্রমগুলিকে দৃঢ় করিবার জন্য—সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য—সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এজন্য লৌকিক চিন্তার উপর যেরূপ দণ্ড-প্রয়োগ হইবে, তাহার ভাগ পাইবার জন্য মনোবিজ্ঞানকেও অগত্যা আসিতে হইতেছে। এটি কোন-রূপে এড়াইতে পারিলেই ভাল হইত—কিন্তু এড়াইবার জো নাই। তত্ত্ব-জ্ঞান, হয় তাহার অস্তিত্বে জলাঞ্জলি দি'ক্, নয় লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন এবং মনোবিজ্ঞানের মত-খণ্ডন এই দুই কার্য্যে প্রবৃত্ত হো'ক্, এ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ফলে, শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে তত্ত্ব-জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটি হইয়াছে কেবল—মনোবিজ্ঞান লৌকিক মতের উৎসাহ-দাতা এবং সহকারী বলিয়া। লৌকিক চিন্তার বিপক্ষতাচরণ কিন্তু—তত্ত্ব-জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। সে যা হো'ক্, চিন্তা-শূন্য লোকের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত-সকলের অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সকলের খণ্ডন-কার্য্যে অধিকতর দৃঢ়তা এবং নির্দ্দয়তা সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া তত্ত্ব-জ্ঞানের কর্ত্তব্য; কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল উপেক্ষা এবং অনবধানতা-মূলক ভ্রান্তি-মাত্র, কিন্তু শেষোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-গুলি সেই ভ্রান্তির গাত্রে সত্যাভাস-পূর্ণ কৃত্রিম বিজ্ঞানের স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিমতী মিথ্যা করিয়া পাকাইয়া তোলে। মনোবিজ্ঞান প্রায়শই লৌকিক চিন্তার পোষকতা-কার্য্যে রত; কিন্তু ঘটনা-গতিকে যখন সে আবার—লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তখন (পরে দেখা যাইবে) সে তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক্—তখন সে আর এক কাণ্ড করিয়া বসে; স্বাভাবিক ভ্রম একতো পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহার সহিত সে আবার তাহার নিজের সৃষ্ট নূতন একটা (কখনো বা অনেক-গুলি) স্ববিঘাত-গর্ভ সিদ্ধান্ত জড়াইয়া ব্যাপারটিকে আরো অপকৃষ্ট করিয়া তোলে।

প্রস্তাবিত তন্ত্র কেন যে, বৈতর্কিক, তাহার কারণ প্রদর্শনের পক্ষে উপরি-উক্ত মন্তব্য-গুলিই যথেষ্ট। স্বেচ্ছা-ক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—এই তন্ত্রটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। যে দণ্ডে মনুষ্যেরা তাহাদের আত্ম-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়-সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব-সকল লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিবে, সেই দণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে, কারণ, তখন আর তাহাকে প্রয়োজন হইবে না।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য পরিস্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য অথবা অভি-সন্ধি অথবা কার্য্য সম্বন্ধে পাছে কেহ কোন প্রকার ভুল বুঝিয়া থাকেন, তাহার প্রতি-বিধানার্থে পুনর্ব্বার স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে যে, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা-দোষ সংশোধন করাই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং সে অনবধানতা-দোষ যেহেতু প্রায়শই মনোবিজ্ঞান কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে—কদাচ সংশোধিত হয় না, এবম্বিধায়—আগে যাহা কেবল বুদ্ধির ভুল হইয়াই ক্ষান্ত ছিল—ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠিয়া মূর্ত্তিমতী মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, এজন্য মনোবিজ্ঞানের খণ্ডন তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি কার্য্য। এই দুইটি কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানকে সমাধা করিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের স্থাপনাত্মক কার্য্য।

কিন্তু এ যা' বলা হইল—এ যদিও তত্ত্ব-জ্ঞানের কার্য্যের একটি সারাংশ, তথাপি এ অংশটি কেবল খণ্ডনাত্মক; অর্থাৎ ইহাতে

কেবল পরমতেরই খণ্ডন হয়, স্বমতের সংস্থাপন হয় না। লৌকিক চিন্তার ভিতর যে-সকল অনবধানতা-মূলক ভ্রম প্রচ্ছন্ন থাকে, ও মনোবিজ্ঞান সেই-সব ভ্রমের যেরূপ পোষকতা করে, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইলে একদিকে যেমন ভ্রমগুলিকে উচ্ছেদ করা চাই, আর এক দিকে তেমনি তাহাদের পরিত্যক্ত বসতি-স্থান একটা কিছু দিয়া পূরণ করা চাই। অবশ্য। আর, সেই যে একটা-কিছু তাহা—স্বয়ং সত্য। অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ই বলো, কার্য্যই বলো, সংকল্পই বলো, আর একমাত্র উদ্দেশ্যই বলো, তাহা সাকল্যে খুলিয়া বলিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা এইরূপ দাঁড়ায়;—কি? না লৌকিক চিন্তার অযত্ন-সুলভ অনবধানতা এবং মনোবিজ্ঞানের প্রযত্ন-পালিত ভ্রম এ-দুয়ের স্থানে প্রকৃত তত্ত্ব-সকলের (অর্থাৎ জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য সকলের) সংস্থাপন—ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। এ তো দেখা যাইতেছে দিব্য সোজা কথা; তবুও অনেকে বিজ্ঞতা ফলাইয়া বলিতে ছাড়েন না যে, তত্ত্বজ্ঞান যে কি তাহা বুঝিয়া ওঠা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তত্ত্বজ্ঞান যে কি, তাহা ঐ আমরা বলিলাম। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, যুক্তির পথ দিয়া সত্যের উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান; এখন এই যাহা বলিলাম (কিনা ভ্রম খণ্ডন-পূর্ব্বক সত্যের সংস্থাপন) ইহা ঐ কথারই পুনরুক্তি—কেবল আর-একটু বিবৃত করিয়া নির্ব্বাচিত। এইটি এখানে দ্রষ্টব্য যে, তত্ত্বজ্ঞান আপনার গন্তব্য-পথে যত অধিক অগ্রসর হয়, ও তাহার পথ যত অধিক পরিষ্কৃত হয়, ততই তাহার সংজ্ঞা অধিকতর পরিস্ফুট-রূপে নির্ব্বাচন-সাধ্য হয়। তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরিতাবস্থা-সুলভ সংজ্ঞা কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-পরিস্ফুট; আর, এখন যে সংজ্ঞা-টি নির্ব্বাচিত হইল তাহা যে, পরিস্ফুটতার চরম সীমায় উত্তীর্ণ, তাহাও নহে। ফলে, সত্য সিদ্ধান্ত-গুলিকে—অর্থাৎ জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী তত্ত্ব-গুলিকে—যে-পর্য্যন্ত না রীতিমত প্রদর্শন করা হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা সামান্যতঃ ভিন্ন বিস্তারতঃ বোধগম্য হইতে পারিবে না। সে তত্ত্বগুলির প্রদর্শন উপক্রমণিকার কর্ম্ম নহে—তাহা সাক্ষাৎ সংহিতারই কার্য্য। যা হো'ক্, বর্ত্তমান সংজ্ঞা দ্বারা এ-টা হইতে পারে—উহা-দৃষ্টে, তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সংকল্প কি, প্রবর্ত্তক প্রয়োজন কি, লোকে তাহা জানিতে পারে; আর, লোকের মাথার ভিতর এই যে এক ভ্রান্ত-বুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে একরূপ মনোবিজ্ঞানই বুঝায় (যাহার উদ্দেশ্য—কে জানে কি—মিছা কেবল কতক-গুলা মনোবৃত্তি লইয়া নাড়া চাড়া আর ঐ রকমের যত-সব ছাই ভস্ম জঞ্জাল) এ দুর্ব্বুদ্ধিটি মাথা হইতে অপনীত হইতে পারে। কর্ম্মের মানুষ বেকার অবস্থায় পড়িলে তাহার যেমন হয়—কাজ খুঁজিতেছে কিন্তু পাইতেছে না—তত্ত্বজ্ঞান এ-যাবৎ কাল সেই ভাবে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কি কার্য্য ঠিক তাহার উপযোগী তাহা যখন সে জানিতে পারিয়া আপন জীবিকা-লাভের একটা কিনারা করিতে পারিবে ও একটা সুনির্দ্দিষ্ট কাজ হাতে পাইবে, তখন তাহার আধি-ব্যথা নির্ব্যথা হইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞান এ কার্য্যের ভার স্কন্ধে লয়।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাতে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তত্ত্বজ্ঞান কেন তাহা স্কন্ধে লয় তাহা বলিতেই হইবে—এইরূপ একটা কোটি ধরিবার কিংবা তাহার উত্তর প্রদান করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের মানস-ক্ষেত্রে ভ্রমের-স্থানে কেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহার কারণ দর্শানো নিষ্প্র-

য়োজন। তবে যদি ইহার নাম কারণ-দর্শানো হয় যে, ভ্রমের স্থানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কেন—না যেহেতু যাহা ঘরে আসিতেছে তাহা সত্য, আর যাহা বাহির হইয়া যাই-তেছে তাহা ভ্রম,—সেই যা এক কথা।

তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং কেন তাহা সে উদ্দেশ্যের অনুগামী হয় তাহাও বলিলাম; এখন সে উদ্দেশ্যটি করায়ত্ত করিবার মানসে তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই কেবল বলিবার অবশিষ্ট। তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান-বিধি যাহা ইতিপূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে (কিনা কিছুই স্বীকার করিবে না—যদি-না তাহা জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য হয়) সেই অনুষ্ঠান-বিধির সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক-চিন্তা-প্রসূত মত সকলকে স্বব্যাহতি-দোষে দোষী নিষ্পন্ন করে। ফলতঃ, লৌকিক সিদ্ধান্ত-সকল যদি স্ববি-রোধী না হইত, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই স্পর্দ্ধাসূচক হইত; কারণ, সে সিদ্ধান্ত-গুলি যদি স্ববিরোধী না হইল—তবে সে-গুলি যে সত্য নহে তাহা কে বলিল? বরং সেই-গুলিরই সত্য হইবার বেশী সম্ভাবনা—যে হেতু সেগুলি জন-সাধারণের মত। এরূপ হইলে, তত্ত্বজ্ঞান বেশী কি আর করিত? হদ্দ এই করিত—এক শ্রেণীর অনুমানকে সরাইয়া তাহার স্থানে আর-এক শ্রেণীর অনু-মানকে আনিয়া পত্তন করিত। অতএব লৌকিক মতের স্বব্যাহতি-দোষ শুধু যে কেবল আরোপ করিলেই হইল তাহা নহে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের কর্ত্তৃত্ব-বলে সে কার্য্যটি করা চাই; নচেৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি স্বেচ্ছা-নুসারে বিচার-নিষ্পত্তি করে, তবে তাহাতে তাহার নিতান্তই ঔদ্ধত্য এবং মূঢ়তা প্রকাশ পায়। এ-টি তবে স্থির যে, লৌকিক চিন্তার প্রত্যেক ভ্রম-সিদ্ধান্ত জ্ঞানের একটি-না-একটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী। সংহিতায় এ বৃত্তান্তটি দেখানো হইয়াছে—পেঁচাও তর্কবিতর্ক দ্বারা নহে—কিন্তু একদিকে লৌ-কিক ভ্রম-সিদ্ধান্ত গুলি এবং আর একদিকে জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-গুলি উভয়কে মুখা-মুখি দাঁড় করাইয়া। উপরি-উক্ত বিবেচনাটি নিম্ন-কৃত প্রণালী-বন্ধনের মূল। এই গ্রন্থে জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-সকল ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত-পরম্পরা-ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইয়াছে; আর, প্রত্যেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটি করিয়া প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দে-ওয়া হইয়াছে,—সে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌ-কিক-চিন্তা-সুলভ স্ববিঘাত-গর্ত্ত ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে; * ইচ্ছা করিলেই দুই পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; ইহাতে লাভ এই যে, কি ব্যাপারে আমরা ব্যাপৃত হইতেছি—কিসেরই বা সপক্ষে আর কিসেরই বা বিপক্ষে আমরা যুঝিতেছি, তাহা আমাদের নিকট অপ্রকাশ থাকিতে পারিবে না। সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হইবে যে, কোন একটি বিষয়-ঘটিত মনো-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়-ঘটিত লৌ-কিক সিদ্ধান্তের সহিত—সর্ব্বাংশেই হউক্ আর কিয়দংশেই হউক্ (প্রায়শই সর্ব্বাংশে) অভেদাঙ্গ; এই জন্য প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি—এক দিকে মনোবিজ্ঞানের ভ্রমাচ্ছন্ন উপদেশ এবং আর-এক দিকে অনবধানতা-মূলক লৌকিক সিদ্ধান্ত—উভয়কেই আপ-নাতে একাধারে মূর্ত্তিমান করিবে। শরী-রের যেমন বাম-দক্ষিণ অবয়ব-শ্রেণী, বর্ত্তমান সংহিতার তেমনি সপক্ষ-প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-শ্রেণী।

* এখানে যাহাকে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে, পুরাতন দর্শন-শাস্ত্রে তাহা পূর্ব্ব-পক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য-পদ্ধতির আরো বিবরণ।

সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি এবং তাহাদের প্রমাণ-প্রদর্শন প্রস্তাবিত গ্রন্থের মূলাংশ বা মুখ্যাংশ। ইহাই দর্শন-সংহিতা। প্রথম সিদ্ধান্তটি বিনা-প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তই কতক-গুলি ধারাবাহিক মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান দ্বারা পরিপুষ্ট। এই সকল মন্তব্য এবং ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—মুখ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে যাহা কিছু অস্পষ্ট এবং কঠিন বোধ হইবে (তা সে ভাবেই হউক্ আর বচনেই হউক্) তাহাকে স্পষ্ট এবং সুগম করিয়া দেওয়া, আর, বৈতর্কিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ যেখানে যাহা আবশ্যক মনে হইবে তাহা যোগাইয়া দেওয়া। এই ভাষ্য-গুলি সংহিতার ন্যায় অতটা কড়াক্কড় হইবে না। হয় তো উহারা যতটা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিত তাহা হয় নাই; কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তত্ত্বজ্ঞানের মূল কাণ্ডের যে যে গ্রন্থি-স্থান হইতে ছোটো ছোটো—কদাচিৎ বা বড় বড়—মতামতের ফ্যাঁকড়া বাহির হইয়াছে, ঐ ভাষ্যগুলি সেই সেই গ্রন্থি-স্থান ঠিক্ ঠাক্ দেখাইয়া দিবে। নানা কারণ-বশতঃ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলিকে সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলির ঠিক্ পরে পরে বসানো সকল সময়ে (বলিতে কি প্রায়শই) ঘটিয়া ওঠে নাই। সেগুলি মন্তব্য এবং ব্যাখানের সীমাভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, এবং আবশ্যক মতে তাহাদের কর্ত্তৃক বিশদীকৃত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি সকল-বিষয়েই সপক্ষ-সিদ্ধান্তগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী; আর, শুদ্ধ যদি কেবল তাহাদেরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া সত্যাভাসের একটি সুসম্বদ্ধ বিগ্রহ। সে বিগ্রহটির বিরুদ্ধে আপত্তি কেবল এই যে, প্রতিপদেই তাহা একটি-না-একটি সার্ব্বভৌমিক সত্য বা জ্ঞানের মূলতত্ত্ব উল্টাইয়া দেয়। কিন্তু কেহ যদি সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন, তবে তাঁহার মনের মত—মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় মত এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক মত—উভয়েরই একটা পরিপাটী শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট সন্দর্ভ তিনি তাঁহার হাতের কাছে সুসজ্জিত পাইবেন। যদি অভিরুচি হয়—স্বচ্ছন্দে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। তিনি দেখিবেন যে, সত্য এবং ভ্রম—বিদ্যা এবং অবিদ্যা—উভয়কে ক্রমাগত পার্শাপার্শি সম-ব্যবধানে লইয়া চলা হইয়াছে; যাহাকে তাঁহার পছন্দ হয় তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন।

এইরূপ প্রণালীর গুণ।

বুঝাই যাইতেছে—এইরূপ প্রণালীতে চলিলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিম্ন-লিখিত-রূপ ফল-লাভ করিবেন। তিনি তাঁহার গন্তব্য পথের প্রত্যেক বিরাম-স্থানে—কোন্ মতটাই বা ঠিক্ আর কোন্ মতটাই বা ভুল—তাহা দেখিতে পাইবেন। দুয়ের তুলনা-গতিকে তিনি দুইকেই ভাল করিয়া বোধায়ত্ত করিতে পারিবেন। যাহা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে তাহা কেবল নয়, তা ছাড়া যাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে, তাহাও তিনি দেখিতে পাইবেন। দার্শনিক মত এবং লৌকিক মত এ-দুয়ের পরস্পর-বিরোধিতা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লৌকিক চিন্তা (যাহা কখনো কখনো সামান্য বুদ্ধি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়) এবং তত্ত্বজ্ঞান, এ দুয়ের বিবাদ-ভঞ্জন খুবই ভালরূপে হইতে পারে—যদি সেই সামান্য বুদ্ধি অলঙ্ঘনীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিচার-নিষ্পত্তি নির্ব্বিবাদে ঘাড় পাতিয়া লয়।

সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের তুলনা না করিবার দোষ।

কোন একটি তন্ত্র কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে (বিশেষতঃ এখনকার মত এইরূপ বিষয়ের সম্বন্ধে) যদি কেবল সত্য মতটি সংস্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, তবে তাহা স্বকার্য্যের অর্দ্ধাংশ-মাত্র সমাধা করে, আর তাহাও পরিপাটী রূপে নহে; কারণ, ভ্রান্ত মতটি প্রকাশ্যে আনীত এবং স্পষ্টরূপে খণ্ডিত না হওয়াতে তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মন হইতে অপনীত হয় না,—বরং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আরো বলবৎরূপে বদ্ধমূল হয়। তাহা হইলে,দুই পক্ষের তুলনা-বিরহে,কিসে-যে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহা হইলে, সত্য এবং ভ্রম দুইই মনো-মধ্যে এক-সঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ শয্যাগত মুমূর্ষু-ভাবে বর্ত্তিয়া থাকে যে, তাহা না থাকারই সামিল। ভুল সিদ্ধান্তটি (স্পষ্টরূপে নহে কিন্তু অনির্দ্দেশ্য এবং অপরিস্ফুট রূপে) প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তাহার পূর্ব্বতন প্রভুত্বের অনেকটা তেজ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, আর সত্য সিদ্ধান্তটি ভুলের মলিন সংসর্গে একে তো কলুষিত তাহাতে সে আবার ভিতরে ভিতরে আপনার পূর্ব্বতন আধিপত্য পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় পরিক্লান্ত হওয়াতে, সে—তাহার উজ্জ্বল-তম এবং অমোঘ-তম রশ্মি-গুলি হারা হইয়া ক্ষীণ-প্রভায় মিট মিট করিতে থাকে। সত্য মত এবং ভ্রান্ত মতের মধ্যে—দার্শনিক মত এবং লৌকিক মতের মধ্যে—এই যে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনির্দ্দেশ্য বিবাদ, ইহাই সংশয়-বাদের এবং অব্যবস্থিত তত্ত্বচিন্তার মূল-কারণ।

সত্যাসত্যের তুলনা-শৈথিল্যই অবোধ্যতার মূল।

দর্শন-কারেরা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যগত বিরোধ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে অবহেলা করাতেই সাধারণতঃ দর্শন-শাস্ত্র অবোধ্যতা-দোষে জড়াইয়া পড়িয়াছে; আর এই ব্যাপারটি, দর্শন-ঘটিত যত কিছু গোল-যোগ, সমস্তেরই মূল। দর্শন-শাস্ত্রের পুরাবৃত্তের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়-লাভ হইলেই ইহা-আর কাহারো অবিদিত থাকে না যে, পূর্ব্বতন দার্শনিকেরা শিক্ষিতব্য সত্য এবং পরিহর্ত্তব্য ভ্রম এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে অবহেলা করাতেই সমস্ত দার্শনিক ব্যাপার অবোধ্যতার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীক-দেশের প্রধান-তম তত্ত্ববিৎ প্লেটোর "আদর্শ জগৎ" সাধারণতঃ অবোধ্য কেন? শুদ্ধ কেবল এই জন্য যে, লৌকিক মত-সকলের অন্তর্গত কোন্ মতটিকে খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ দার্শনিক-মতটির অবতারণা করিয়াছেন—তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলেন নাই। জর্ম্মান-দেশীয় তত্ত্ববিৎ স্পিনোজা'র "আধার-বস্তু" এখনো পর্য্যন্ত অর্থ-হীন রহিয়াছে কেন? ঐ একই কারণ-বশতঃ। উহা কোন্ লৌকিক ভ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা আমরা অবগত নহি। সুবিখ্যাত লাইব্‌নিট্‌জের "তন্মাত্র," তেমনি আবার তাঁহার "পূর্ব্ব-নিবদ্ধ কার্য্য-কারণ-সূত্র," এ সব রহস্যের এখনো পর্য্যন্ত চাবি মিলিতেছে না কেন—অথবা চাবি যাহা মিলিতেছে তাহা তালায় লাগিতেছে না কেন? শুদ্ধ কেবল এই জন্য যে, লৌকিক চিন্তার কোন্ ভ্রমটির পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার কোন্ মতটি স্থাপন করিতে অভিলাষী, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। জর্ম্মাণ দেশীয় তত্ত্ববিৎ হেগেল্ কেন আগা-গোড়া বজ্র-সংহত পর্ব্বতের ন্যায় অভেদ্য? কি জানি—তিনি হয় তো প্রকাণ্ড একটা অজগরের ন্যায় লৌকিক একটা ভ্রমকে শরীরের জাঁতোর বশে আনিয়া পিসিয়া গুঁড়া গুঁড়া করি-

তেছেন, কিন্তু সে ভ্রমটি যে কি তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। প্রবল পাক-চক্রের পেষণে তিনি হয় তো সে ভ্রমটির একখানি-ও অস্থি অবশিষ্ট রাখেন নাই —কিন্তু আমরা তাহা জানি না। তাঁহার সিদ্ধান্ত-গুলি (অবশ্য তাহাদের আপনাদের রীত্যনুযায়ী অস্পষ্ট এবং জটিল রকমে) কোন-না-কোন লৌকিক মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে—ইহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু সাক্ষাৎ কল্পে (এমন কি দূর কল্পেও) দর্শনকার সে-সম্বন্ধে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানের গতি-রোধক কারণের কথা পূর্ব্বে যাহা আমরা বলিয়াছি—ঐ প্রকার অবহেলা বা ত্রুটি তাহারই পোষকতা করিতেছে; গতি-রোধক কারণ-সে এই ;—প্রবর্ত্তক মূলতত্ত্ব-গুলি—গোড়ার ক-খ—দৃঢ় মুষ্টিতে আয়ত্ত না করা ও চক্ষু মেলিয়া ভাল করিয়া না দেখা ; কি কার্য্য করিতে হইবে এবং কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে তাহা পরিষ্কার-রূপে না জানা। কারণ, যদি ঐ-সব দর্শন-ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কার্য্য কি তাহা জানিতেন, তবে তাহা তাঁহারা বলিতেন, তাহা শুধু নয়—তাহা তাঁহারা করিতেন। কিন্তু সে-বিষয়ে হয় তাঁহারা একেবারেই চুপ, নয় এমনি ইতস্তত করিয়া কথা বলেন যে, তাহা অপেক্ষা চুপ থাকাই ভাল ছিল। এ জন্য, যদিও তাঁহারা মহোচ্চ প্রতিভা-সম্পন্ন এবং "অবিনশ্বর বস্তু-সকলের প্রশান্ত স্রষ্টা" তথাপি অবোধ্যতা-দোষে তাঁহাদের পশ্চাদ্দত্ত অন্তিম দানের মূল্য অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাঁহাদের প্রকৃত কার্য্যের অর্দ্ধেক-খানি কেবল তাঁহারা হস্তে লইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে। যাক্‌দিলায় তাঁহারা আমাদিগকে সত্য প্রদান করিয়াছেন—নিঃসন্দেহ তাহা তাঁহারা করিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ সত্যকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমের সহিত তুলারূঢ় করা না হয়, ততক্ষণ তাহা সংর্ব্বাংশে না হউক্ অনেকাংশে বুদ্ধির অগম্য থাকে। উপরি-উক্ত দর্শন-কারেরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রম-গুলিকে চক্ষের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিতে বিধিমত-প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই জন্য, ঐ সকল এবং আর আর অনেক দর্শনকারদিগের সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের শাস্ত্র কাহারো বোধগম্য হইবার নহে; শাস্ত্রকারের নিজের আলোকে তো নহেই—তবে যদি জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার প্রদীপ আপনি খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া তাহা অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে সঙ্গে করিয়া আনে, এবং আপনি তাহার উপকরণ সকল গুছাইয়া ঠিক্ করে, তাহা-হইলেই যা'। যে কোন সত্য হউক্ না কেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমই তাহার আলোক; এ জন্য, সত্যের চিন্তার সময়ে এবং তাহার প্রদর্শনের সময়ে, তত্ত্ববিদ্‌গণের, এইটির প্রতি সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যে, তৎকালে তাঁহারা যেন অতিমাত্র গৌরবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমের চিন্তা এবং প্রদর্শন হইতে সরিয়া না দাঁড়ান; প্লেটো স্পিনোজা লাইব্‌নিট্‌জ হেগেল্ প্রভৃতি মহাত্মারা নিশ্চয়ই ঐরূপ করিতে গিয়া আপনারাই আপনাদের গভীর জ্ঞান-চর্চ্চা মাটি করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য মনুষ্য-সাধারণকে বিস্তর ক্ষতি ভোগ করিতে হইতেছে; তাঁহাদের প্রদর্শন-পদ্ধতি যদি অন্যরূপ হইত, তবে তাঁহাদের সুমহৎ জ্ঞান সাধারণের প্রভূত উপকারে আসিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই তত্ত্ব সত্য মিথ্যার তুলনা-সংস্থাপক।

এই জন্য এই তন্ত্র উহাঁদের ও-পথে না গিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন-বর্ত্তী অন্যবিধ পথ অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ইহার কেবল চেষ্টা—সত্যকে বোধ-সুলভ

করা; তাই, ভ্রমের সহিত প্রবল এবং স্পষ্ট প্রতিযোগিতার গুণে সত্যের উপরে যেরূপ আলোক নিপতিত হয়, তাহাই ইহার প্রধান নির্ভর-স্থল। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার সাহায্যে সত্যকে পরিস্ফুট করিতে অভিলাষী। সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়বিধ সিদ্ধান্তের সন্নিবেশ-পদ্ধতি কতক-টা নূতন-ধরণের বটে, কিন্তু উপরিউক্ত বিবেচনা-টি তাহার মূল-প্রবর্ত্তক। অবিমিশ্র দার্শনিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে হইলে ঐ-টিই তাহার একমাত্র বিহিত পদ্ধতি; কারণ, সাধারণ বোধ-সৌকর্য্য পক্ষে উহা সবিশেষ উপকারী, আর উহা দার্শনিক আলোচনা-সুলভ সংশয়াত্মকতা দ্বৈধ এবং অব্যবস্থিতি সমস্তেরই অপহর্ত্তা। অন্যবিধ পদ্ধতি যাহার সংকল্প কেবল সত্যেরই প্রদর্শন—ভ্রমের প্রতি-প্রদর্শন নহে—তাহাকে ঐ সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বঞ্চিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ।

স্বর্গ ও নরক।

ঐ যে অশীতিপর বৃদ্ধ দেখিতেছ, আহা উহাঁর কি সুন্দর মুখ-শ্রী! বদন-মণ্ডলে কি পবিত্র ও মহৎ ভাব উপছিয়া পড়িতেছে। মুখে পূর্ণ বিমলানন্দের চিহ্ন কেমন স্পষ্ট প্রতিভাত! উহাতে বিষাদের চিহ্ন নাই, দুশ্চিন্তার কালিমা নাই, নৈরাশ্যের অন্ধকার নাই। এই বৃদ্ধ-বয়সেও ইহাঁর শরীর কি তেজঃপুঞ্জপূর্ণ! দেহের কি মনোহর কান্তি! যেন পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। ইহাঁর যেরূপ বাহ্য মহত্ত্বব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য, আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব তদপেক্ষা অধিক। ইনি সমস্ত জীবনে কখন জানিয়া শুনিয়া কোন পাপকার্য্যের, কোন অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। আজীবন অক্লান্ত ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কখন কোন কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা করেন নাই। স্বীয় শক্তি ও সাধ্যানুসারে চিরকাল আত্মীয় স্বজনের স্বদেশের ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। রিপুগণ কখন ইহাঁকে বশীভূত করিতে পারে নাই, রিপুগণকে ইনি সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। পাপ প্রলোভনে ইনি কখন প্রলুব্ধ হয়েন নাই, বিবেক-বলে ইনি শত শত প্রলোভনকে পরাজয় করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে বলিতে পারে যে ইনি তাহার প্রতি কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন কিম্বা তাহাকে কোন প্রকারে মনঃকষ্ট দিয়াছেন। ইহাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস অতি গভীর, দৃঢ় ও অবিচলিত। ইহাঁর জীবনে কত ঘটনা হইয়াছে যাহা অবিশ্বাসীর চক্ষে বড়ই ভয়ানক, ও বিধাতা-পুরুষের ঘোরতর নির্দ্দয়তার পরিচায়ক, কিন্তু ইহাঁর এমনি বিশ্বাস-বল যে ইনি সে সকল ঘটনায় ঈশ্বরের নিয়মের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইয়াছেন। অতীত জীবনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া ইনি তাহাদিগের মধ্যে এমন একটীও কার্য্য দেখিতে পান না যাহার জন্য ইনি দুঃখিত বা অনুতপ্ত হইতে পারেন। বর্ত্তমান জীবনে ইনি ইহাঁর ধর্ম্মবলে, বিশ্বাস-বলে, বিবেক-বলে ও পবিত্রতা-বলে পরম সুখী, আর ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে ইনি কিছুমাত্র চিন্তিত বা সন্দিগ্ধ নহেন—ভবিষ্যতের পারলৌকিক আধ্যাত্মিক সুখৈশ্বর্য্য ইহাঁর বিশ্বাস-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জলন্তরূপে প্রকাশিত। ইনি স্বীয় জীবনের পবিত্র অতীত ভাবিয়া, পবিত্রতর বর্ত্তমান উপভোগ করিয়া এবং পবিত্রতম ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া পরম সুখী। ইহাঁর আত্মা সর্ব্বদাই প্রেমে উন্মত্ত, শান্তিতে অভিষিক্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, আশায় উল্লসিত ও ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট। এই পৃথিবীতে ইনিই স্বর্গের প্রতিরূপ।

আর ঐ যে একটী বৃদ্ধ দেখিতেছ, উঃ উহার কি কুৎসিত আকৃতি। উহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে কেমন আপনা হইতে ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। কি বিকট মুখ-শ্রী। যত প্রকার নীচ ও অপবিত্র ভাব হইতে পারে যেন তৎসমস্ত ইহার মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহার বদনমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন মাত্র নাই, উহা বিষাদে বিকৃত ও অবনত। বয়স অধিক হয় নাই, অথচ এ ব্যক্তির দেহ বৃদ্ধত্বের সকল লক্ষণাক্রান্ত। শরীর কি মলিন ও কান্তিবিহীন! যেন মূর্ত্তিমান অস্বাস্থ্য। ইহার বাহ্য শ্রী-হীনতা অপেক্ষা ইহার আন্তরিক শ্রী-হীনতা আরও অধিক। পাপাচরণে, অধর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কর্ত্তব্য কার্য্য কাহাকে বলে এ ব্যক্তি তাহা কখন জানে নাই। কাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা কখন জানিতে কিম্বা তদনুসারে কার্য্য করিতে এ ব্যক্তি কখন চেষ্টা করে নাই। রিপুগণ সর্ব্বদা ইহাকে পরিচালিত করিয়াছে। রিপুগণের বশীভূত হইয়া এ ব্যক্তি শত শত পাপ-কর্ম্ম করিয়াছে। কত লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে। কত লোকের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরে ইহার বিশ্বাস নাই, পরকালে ইহার আস্থা নাই। সুতরাং পৃথিবীর নানা বিপদপাতে ইহাকে অশেষ আন্তরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। বহুকাল পাপ করিয়া করিয়া এখন ইহার পাপবৃত্তি সকল ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, এখন অতীত জীবনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া ইহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; বর্ত্তমান জীবনেও ইহার দুঃখের অন্ত নাই, রোগে জর্জ্জরিত, চিন্তায় ক্লিষ্ট, নানা সাংসারিক দুর্গতিতে কত বিব্রত; আর এই অতীত ও বর্ত্তমানের ঘোর যন্ত্রণায় নিমগ্ন হইয়া যখন ভবিষ্যতের দিকে এই ব্যক্তি চাহিয়া দেখে তখন ইহার আর পরিতাপের অন্ত থাকে না। ইহার বিশ্বাসহীন আত্মা ভবিষ্যতে দেখিতেছে কেবল অন্ধকার। এ ব্যক্তি ইহার জীবনের অশেষ ক্লেশময় অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় অন্তর্ঘাতনায় সর্ব্বদাই অস্থির। ইহার আত্মা সর্ব্বদাই পাপ-বাসনায় বিচলিত, কৃত পাপকর্ম্ম জন্য অনুশোচনায় পরিতপ্ত এবং অশান্তি নিরানন্দ ও নৈরাশ্য-সমুদ্রে ভাসমান। এই পৃথিবীতে এই ব্যক্তি নরকের প্রতিরূপ।

দেব-পথ।

কাল কাল দেশ দেশ অতিক্রম করি,
কে জানে কোথাও তার আছে কি না শেষ;
কোথা হ'তে আসিতেছে কোন্ অসীমেতে
রাখিয়াছে আপনার অতীত উদ্দেশ।

মরণ মরিয়া আছে কোন্ প্রান্তে তার,
সম্মুখে অক্ষয় শিব অনন্ত জীবন;
দুদিগে আনন্দ আর অমৃতের ধার
পিপাসু পথিক তরে বহে অনুক্ষণ।

আপন সকৃৎ-বিভা করিয়া বিকাশ
রহিয়াছে চির দিন নীরব জাগ্রত,
লক্ষ্যহারা হ'য়ে তাই বিশ্বচরাচর
মরণের অন্ধকারে হয় না নিহত।

বিমল জ্যোতির মাঝে ঠাঁই নাহি পে'য়ে
আঁধার ঘুরিছে হেথা সংসার প্রাঙ্গণে;
সংসারের অন্তরালে ওই দেব-পথ,
ধর তাহা যদি চাও বাঁচিতে জীবনে।

ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্ত্তমান।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কাল তর্কের কাল। এতদ্দেশীয় অনেকেই অজ্ঞানে উপহত ছিল। অনেকে প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম্মে তৃপ্ত না হইয়া খৃষ্টীয় পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিতেছিল। সেই সময় রামমোহন রায় সকলকে প্রকৃত ধর্ম্মে স্থাপন করিবার উদ্দেশে হিন্দুসমাজে তুমুল তর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভ্রান্তি-নিরাস। হিন্দুশাস্ত্র হইতে সেই ভ্রম বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং সেই শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় তাহা দূর হইয়া যায়। কিন্তু রামমোহন রায় হিন্দুসমাজের যে অবস্থায় উত্থিত হন তখন স্বাধীন মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। দেশকাল তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তিনি মনের সকল কথা সকলের সহিত বলিতে পারিতেন না। হিন্দুর নিকট তাঁহার প্রবেশ-দ্বার শাস্ত্র। কারণ স্বাধীন বুদ্ধি অপেক্ষা তখন শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অধিক ছিল। সুতরাং তিনি সেই শাস্ত্রপ্রমাণে যা কিছু বুঝাইতে পারিতেন উহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। এইরূপে তিনি শাস্ত্র দ্বারা একেশ্বরবাদ সিদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু শাস্ত্রই আবার ভবিষ্যতে বিশেষ অনর্থের মূল হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের অবলম্বন প্রধানত বেদ ও বেদান্ত। নিত্যতাই বেদের প্রামাণিকতা এই বিশ্বাস তৎকালে লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে তিনি এই সাধারণ বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়াছেন। তথাচ তিনি যখন দেশকালপাত্রের অনুরোধে এই বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া যান তখন লোকের মনে বেদের নিত্যতার উপর বিশ্বাস অটল ছিল। তাঁহার লক্ষ্য যে কোনরূপে হউক দেশব্যাপী উপধর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম্ম উন্নত না হইলে নির্জ্জীব হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে না। লোকে বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বেদ-প্রমাণে যদি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ত্তমানে এই টুকুই পরম লাভ। সম্ভবত তিনি এই জন্য বেদের উপর কোন রূপ আঘাত করিতে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার সহযোগী সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ দেন তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শঙ্করের ন্যায় বেদ ও অনুভবকে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশের স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাও আছে যে মনুষ্য চরমে ঈশ্বরে লীন হয়*। বিদ্যাবাগীশ প্রাচীন কল্পের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যে শিক্ষা রামমোহন রায়কে স্বাধীন বুদ্ধি দিয়াছিল কিছু দিন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেরূপ শিক্ষা ছিল না। ফলত তিনি যে একজন বৈদান্তিক ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় না। এই বেদান্তবিৎ পণ্ডিত যে উপদেশ ও আলাপে লোকের মনে বেদের নিত্যতা ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া যান এই বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যানই প্রমাণ। যাহাই হউক বেদ নিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ইতিহাসে যে এই কথা পাঠ করা যায়, সম্ভবত এই টুকুই তাহার মূল।

ইহার পর শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কাল বা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও

* বিদ্যাবাগীশের ৯১০ ব্যাখ্যান দেখ।

কার্য্যের কাল। ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা যে এক সময় কোনও আকস্মিক ঘটনায় ইহাঁর মনে একটা ঘোর ঔদাস্য আইসে। সেই ঔদাস্য দূর করিবার জন্য ইহঁার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তিনি বিদ্বেষ ও পক্ষতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে বহুদিন নির্জ্জনে ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। ইহার ফল তাঁহার আত্মজ্ঞান। একদা এই মহামতি স্বচিন্তায় জড়ের সহিত দেহের একতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে এই জড় হইতে স্বতন্ত্র অথচ এই জড়ের দ্রষ্টা স্প্রষ্টা আর একটী কিছু আছে। তাহাই আত্মা। এই আত্মজ্ঞানে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অনুস্যূত। ব্রহ্ম যে চেতন-ধর্ম্মী আত্মজ্ঞান তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিল। তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে একরূপ নিঃশংসয় হইলেন। পরে তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়। তিনি এই সকল শাস্ত্রে আপনারই হৃদিস্থিত ব্রহ্মভাবের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তদবধি ইহার উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। পরে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হয় বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটিল। ফলত এইটী ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী বিশেষ সময়। রামমোহন রায়ের প্রখর মস্তিষ্কের উপর ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুপ্রশস্ত হৃদয়ের উপর ইহার স্থিতি। রামমোহন রায় শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া বুদ্ধিবলে এক ব্রহ্মকে উদ্ধার করেন কিন্তু ইনি প্রাণের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য প্রখর অনুসন্ধানে অন্তরাত্মায় পরমাত্মার দর্শন পান। এক জন জ্ঞান-প্রধান আর এক জন ভাব-প্রধান। ধর্ম্মজগতে এই দুই উপাদানই অপরিহার্য্য এবং তুলাদণ্ডে উভয়েরই গৌরব একই রূপ। ফলত এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা কেবল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার, সুতরাং তিনি কেবল শাস্ত্রীয় তর্কে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কিন্তু তিনি তর্কমুখে শাস্ত্রে যে সমস্ত আবর্জ্জনা আছে দেশকালের অনুরোধে তাহা পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় প্রথমত তাহারই সংস্কার আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে এই সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম পাঠ করা যায়। ফলত বেদ বেদান্তই এই গ্রন্থের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা। রামমোহন রায়ের তর্কমুখে শাস্ত্র হইতে যে সমস্ত জ্ঞানবিরোধি মত ও বিশ্বাস আসিয়াছিল এই গ্রন্থ তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ধর্ম্মশিক্ষক স্বয়ং আত্মা। তিনি স্বচিন্তায় ধর্ম্মকে পান। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হয় ধর্ম্মের উৎস স্বয়ং আত্মা। তখন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন বেদ অনিত্য। যে কোন দেশের যে কোন গ্রন্থে সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। বেদের ন্যায় কোরাণ বাইবেল সকলই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মসমাজ এত কাল বেদ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছিল এতদিন পরে তাহার মূল শিথিল হইয়া পড়িল।

এখন প্রশ্ন এই যে এ দেশে বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বলিয়া বহুকাল যাবৎ আদৃত কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা

ধর্ম্মনির্ণয়স্থলে বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী ও সাধু. যাঁহার পক্ষপাত ও বিদ্বেষ কিছু মাত্র নাই, তিনিই হৃদয়ে ধর্ম্মের অনুমান করিতে পারেন। আমরাও বলি এই রূপ অধিকারির নিকট ধর্ম্মানুমানে বেদের প্রামাণিকতা যৎস্বল্প। কিন্তু এরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নয়। এই জন্য দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা যথেচ্ছ পরিবর্ত্তের মুখ হইতে সৎধর্ম্ম ও সদাচারকে রক্ষা করিবার আশয়ে বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বলিয়া একটা শাসন রাখিয়া যান। কেবল এই দেশেই বা কেন অন্যান্য দেশেও লোকে স্বস্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে। তবে বিভেদ এই যখন কুত্রাপি কোনও ধর্ম্ম-শাস্ত্র হয় নাই তখন এই ভারতে বেদের এই মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল। ফলত এইরূপ প্রচার একটা শাসন মাত্র। ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য অনধিকারিদিগের জন্য ধর্ম্মের একটা ব্যবস্থা স্থাপন। নচেৎ ধর্ম্ম ও আচারে লোকের একতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোনও একটি আকস্মিক ঘটনায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং তিনি বিদ্বেষ ও পক্ষপাতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফল তাঁহার আত্মজ্ঞান। অধিকারিতার পক্ষে এই টুকুই যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ধর্ম্মানুমানে তাঁহার হৃৎপ্রত্যয় পর্য্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এইরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নহে। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তির প্রসক্তি রাখে। ফল কথা সাধন-সাপেক্ষ। এই জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদের নিত্যতা অস্বীকার করিয়াও স্বয়ং অটল রহিলেন কিন্তু বেদের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তরূপ ঘোষণা গূঢ় রূপে ব্রাহ্মসমাজে একটা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তের বীজ রোপণ করিল। ব্রাহ্মসমাজে যখন এই ঘটনা হয় তখন এদেশে জ্ঞানকরী বিদ্যা কেবল ইংরাজী। একেতো দেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের চর্চ্চা প্রায়ই ছিল না। তাহার উপর আবার ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের ধর্ম্ম ও এ দেশের আচারের উপর লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জন্মাইতেছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এইরূপ যে শিক্ষা ইহাই স্বয়ং কুসংস্কার এবং ইহাই ধর্ম্মানুমানের ব্যাঘাতক হইয়া উঠিল। সুতরাং তৎকালে কেবল ইংরাজীশিক্ষার বলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বাইবল ও খৃষ্টকে ধর্ম্ম-শিক্ষকের পবিত্র অধিকার অর্পণ করিলেন। আমরা বলিয়াছি যে বেদ বেদান্তে আপনার হৃদিস্থিত ধর্ম্ম-ভাবের প্রতিবিম্ব আছে বলিয়া উহাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের হৃদয়ের অনুরাগ। এতদ্ব্যতীত বেদ বেদান্ত অবলম্বনে তাঁহার আরও কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের সংস্কারক। তিনি তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং এই লোকহিতৈষণা বৃত্তিতে অটল বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার উপর কোনও আধিপত্য করিতে পারিল না। তিনি যদিও এক দিকে বেদের অনিত্যতা ঘোষণা করিলেন এবং সকল দেশের সকল শাস্ত্র—যাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু সেই বেদই তাঁহার জীবন ও আলোক হইয়া রহিল। তিনি এদেশে সম্যক গৃহীত হইবার জন্য এই হিন্দুশাস্ত্র বেদ বেদান্তের প্রসাদাৎ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু-প্রাণের সঞ্চার করিলেন। ফলত ইহাই প্রকৃত স্বদেশানুরাগ। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই এই টুকুর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যে বেদের ন্যায় কোরণ বাইবল প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থকে—যাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে

সেই গ্রন্থকে ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহারই মর্ম্ম তাঁহাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিল। সুতরাং তদবধি ধর্ম্মশিক্ষার জন্য প্রধানত বাইবল অনেক ব্রাহ্মের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু বাইবলের ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দুর নিকট কোনও অংশে কার্য্যকরী হয় না। বাইবল যে কেন হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী নয় তাহারও কারণ আছে। দেখ, প্রত্যেক লোকেরই সাধন ও সিদ্ধ এই দুইটী অবস্থা আছে। সিদ্ধাবস্থায় তুমি হু আল্লা বা গড্ যে নামেই ঈশ্বরকে ডাক, যে কোন ভাষায় তাঁহার স্তুতি বা বন্দনা কর তোমার প্রাণের তৃপ্তি হইবে। কারণ তখন ঈশ্বর তোমার করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় হইয়া আছেন। নাম বা ভাষা একটা ব্যবধান ঘটাইয়া তাঁহা হইতে আর তোমাকে দূরে ফেলিতে পারে না। কিন্তু সাধনের অবস্থা ঠিক্ এরূপ নয়। তুমি অবশ্য যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্যটী পাইতে পার কিন্তু তাহা হইতে জীবন পাইবে না। আবার সত্য যতক্ষণ না জীবন আনিয়া দেয় তাবৎ তাহাতে কোন বিশেষ উপকার নাই। আমরা শৈশবকাল হইতে মাতৃস্তন-দুগ্ধের ন্যায় দেশীয় ভাষা ও দেশীয় ভাবে পুষ্ট হইয়া থাকি। নানা ভাব-সংশ্রবে দেশীয় ভাষা ও ভাব আমাদের প্রাণ্ বা মনে অবস্থান্তর উৎপাদন করিয়া থাকে। মনে কর শান্তি শান্তি বলিলে আমরা মনে কেমন তৃপ্ত হই কিন্তু ভাবে উহারই প্রতিরূপ কোন কথায় যদি বলি আমার মনে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হউক ইহাতে আমাদের মন কখন সেরূপ তৃপ্ত হইবে না। মনে কর এস্থলে শান্তি শব্দটী আমাদের শৈশবের স্তন-দুগ্ধ। ইহা দ্বারা আমাদের প্রাণের বল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিজাতীয় ভাবব্যঞ্জক স্বর্গরাজ্য শব্দটী আমাদের শৈশবের গোদুগ্ধ। ইহাতে অবশ্যই কিছু পুষ্টি আছে কিন্তু তাহা আমাদের প্রাণের পুষ্টি নয়। এখন দেখ সত্য কেবল শিক্ষার জন্য নয় উহা জীবনে ব্যবহার করিবার জন্য। সুতরাং দেশীয় ভাব ও ভাষার গূঢ় শক্তিই যখন প্রাণ-সঞ্চার করা তখন সাধনের অবস্থায় ইহাই যে বিশেষ উপযোগী তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। বলিতে কি, ইহা ব্যতীত সাধন হইতেই পারে না।

যাক্, এইরূপে ইয়োরোপীয় বাইবল শাস্ত্রানুশীলনে যখন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের আনন্দলাভে বঞ্চিত হইলেন তখন তাহার গতি বাহ্য কার্য্যের দিকে ফিরিল। ইহার নাম সমাজ-সংস্কার। এস্থলে আরও একটু কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান তো অনেকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ধর্ম্মশিক্ষক প্রধানত বাইবল বা খৃষ্ট; এই মণিকাঞ্চন-যোগে কেবল সমাজ নহে ব্রাহ্মধর্ম্মও খানিকটা রূপান্তর ধারণ করিল। ইহা কাহারই অবিদিত নাই যে ঐ সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্ট-মহিমা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জীবন-সমুদ্রে খৃষ্টই ধ্রুব তারা। তাঁহার রক্তমাংস পর্ব্বোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মের দগ্ধোদরের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। জার্ডন নদী পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন। এবং খৃষ্টের মৃত্যুদিনে উপবাস একটী ধর্ম্মকার্য্য—ব্রতচর্য্যার মধ্যে হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের অঙ্গে যেমন এই পরিবর্ত্ত ব্যবহারেও আবার এই রূপ। বিধবাবিবাহ, বৈজাত্য বিবাহ, মনুষ্য-সাক্ষিক বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পরিচ্ছদ, জীবন-প্রণালী, এ সকলই ইয়োরোপের অনুকরণে অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্মে বার আনা এবং ব্যবহারে ষোল আনা খৃষ্টান সাজিয়া ব্রাহ্মসমাজ বড় শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি হৃৎপ্রত্যয় ধর্ম্মানুমানে প্রমাণ। সুতরাং ব্রাহ্ম বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়া উহাকে দুর্গম পথের অভ্রান্ত নেতৃত্ব দিতে পারেন না। কিন্তু এই ভারতবর্ষে আজই যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ বেদের এই অনিত্যতা স্বীকার করিতেছে তাহা নহে, ইতিহাসে দৃষ্ট হয় অতিপূর্ব্বে বৌদ্ধেরাও ঐ রূপ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা বেদের অনিত্যতা স্বীকার করিলেও আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রচুর উপাদান দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে বৌদ্ধেরা এক সময়ে বেদোক্ত ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং যাগযজ্ঞের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হয়। একটা বস্তুর দূষিত অংশ বাদ দিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণকেই সংস্কার বলা যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছিল। এই জন্য প্রবাদ আছে বৌদ্ধধর্ম্ম আর কিছুই নয় উহা প্রচ্ছন্ন বেদান্ত ধর্ম্ম। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন রায় হিন্দুসমাজে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার এই উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বেদ অনিত্য ইহা ঘোষণা করিয়াও হিন্দুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকেই সংস্কৃত আকারে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই কারণে অদ্যাবধি এই আদি ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদী হিন্দুদিগেরই সমাজ হইয়া আছে। এখানকার ধর্ম্ম সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্যবহার সংস্কৃত হিন্দু ব্যবহার। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার এই গূঢ় ও গভীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহাদিগের হস্তে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে নানা রূপ বিজাতীয় ভাব মিশিয়াছে এবং সমাজ-সংস্কারও এই বিজাতীয়তার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু ঈশ্বর অন্ধের পথ-প্রদর্শক। তিনি গোপনে গোপনে যে কার্য্য করেন কেহই তাহার সন্ধান পায় না। এই রূপে দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে আবার ব্রাহ্মসমাজের স্রোত ফিরিয়া আসিল। এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই খ্রিষ্টীয় ভাবে বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। অনেকেই এখন ধর্ম্মে হিন্দু এবং জীবনে হিন্দু। হিন্দু জ্ঞান ও হিন্দু যোগ অনেকেরই ধর্ম্ম-পিপাসা শান্তি করিতেছে। ইহার পূর্ণ বিকাশ-স্থল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ। আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক রূপকের যে টুকু অনিষ্ট-কারিতা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের বিষয় বিশেষ কিছুই বলি নাই। ইনি ব্রাহ্মের মধ্যে সরলতার একটী প্রতিমা। যখন যে টুকু মুক্তির পথ বলিয়া বুঝিবেন ইনি তখনই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। অনেক কথা রটিতেছে। কিন্তু আশা করি অনেক কথাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার কোন কোন মত যে দোষস্পৃষ্ট আমরা তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু তৎসত্বেও আমরা দেখিতেছি তিনি প্রকৃত হিন্দু হৃদয় পাইয়াছেন। যেখানে যে ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও ঈশ্বরের কথা হয় সেইখানে তিনি আপনার প্রাণারাম ঈশ্বরকে দেখেন এবং সেই খানেই ঈশ্বরকে প্রণাম করেন ইহাই প্রকৃত হিন্দু হৃদয় এবং ইহাই হিন্দুর প্রকৃত যোগ ও প্রকৃত ভক্তি।

এস্থলে প্রসঙ্গত একটী ঘটনা মনে পড়িল। আমি একদা কোন খ্রিষ্টীয় ভজনালয়ে গিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ বমুইচ সাহেব তথাকার আচার্য্য। বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম একটী তিলকধারী বৃদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে উপদেশ শুনিতেছেন।

আসিবার সময় নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলাম আপনি বিধর্ম্মীর ভজনালয়ে কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন ঐ বিদেশী ভক্তিমান আচার্য্য যে আমারই প্রভুর নাম করিতেছেন। আর উহাঁর হৃদয় হইতে যে ভক্তির স্রোত বাহির হইতেছে কায়মনে প্রার্থনা করি যেন ঐরূপ আমারও হয়। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম ইহাই ভক্তিমান হিন্দুর উদার হৃদয়। বলিতে কি আজ আমরা বিজয়কৃষ্ণে সেই হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। তিনি একজন যথার্থতই সাধু ও ঈশ্বরভক্ত।

সত্য।

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বোলে।
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে;
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধুলির শয়নে,
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হ'তে।

বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ্গ' অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙ্গে যায় সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সেত কারাগার
ভেঙ্গে ফেল আসিবেক স্বরগের আলো!
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি,
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত-গতি!

(২)

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর!
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি
চিরস্থির শুভ্র হাসি প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়।
আপন মহিমা হেরি পুলকে হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়।

আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়
ধুলি হতে তুলে এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুব তারা তুমি রেখেছ যেথায়,
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগেরবে, নিবিবে না আর—
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার!

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা গুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

২। সামবেদ সংহিতা কৌথুমী শাখা।

Journal of the Asiatic society of Bengal. Vol LV, Part 11. N 11—1886.

Bibliotheca Indica. Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. No 567. (Parasara smriti)
N. S. N. 568. (The Nirukta)
N. S. N. 569. (Muntakhab-ut-Tawarikh)
N. S. 570. (Zafarnamah)
N. S. 571, 572 (Akbarnamah)
N. S. 573, (Tattva chintamani)
N. S. 574 (The Asvavaidyaka)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Apl 1886.

Report of the Southern India Brahmo Samaj fer 1885.

Theosophist—July 1886.
Fellow Worker VoL, I, No. 6.
The Hindu Reformer Vol 1. No. 12.
The Interpreter for April 1886.
ভারতী ও বালক। আষাঢ় ১৮০৮ শক।
বামাবোধিনী পত্রিকা। আষাঢ় ১২৯৩।
নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৩।
বান্ধব। আশ্বিন ১২৯২।
আসাম বন্ধু। মাঘ ফাল্গুন ১৮০৭।
সজ্জন-তোষিণী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।
তত্ত্ব-মঞ্জরী ১ম ভাগ ১২ সংখ্যা ১২৯৩।

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০৪৪।/০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৯৩২৶৩
সমষ্টি	৫৯৭৬॥৩
ব্যয় ...	২৯৬৭৸৶০
স্থিত	৩০০৮॥/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৫৬।/০
সাম্বৎসরিক দান প্রাপ্তি।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০৲
" ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য	২০৲
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত ...	১০৲
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী ...	১২৲
শ্রীযুক্ত রামসুন্দর রায়, ক্ষেতুপাড়া পাবনা	১৫৲
,, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	২৲
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী ...	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল ...	২৲
,, ,, চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত পাণ্ডুয়া	৫৲
,, ,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...	১৲
,, ,, শিবচন্দ্র দেব ...	৫৲
উহঁার বনিতা ...	১০৲
	১৯৪৲
জনেক ব্রাহ্ম ...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় ভাগলপুর	১৲
,, ,, রামলাল ঘোষাল ...	১৲
,, ,, রাধামোহন বসু আন্দুল	১৲
,, ,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ হুগলি	২৲
,, ,, দীননাথ অধ্যেতা ...	২৲
,, ,, অম্বিকাচরণ মৈত্র ...	২৲
পরলোক গত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	১৲
,, ,, আশুতোষ রায় জব্বলপুর	১৲
,, ,, নবগোপাল মিত্র ...	।০
শুভকর্ম্মের দান।	
রায় রমণীমোহন চৌধুরী তুষভাণ্ডার	১৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় ভাগলপুর	২৲
দানাধারে প্রাপ্ত। ...	১৮/০
	২৫৬।/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৮২৴০
পুস্তকালয় ...	২৫৮।৶০
যন্ত্রালয় ...	১২৩৪৶৯
গচ্ছিত ...	৪৩০॥/৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১১২৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১৫০৲
দাতব্য ...	১১৭৲
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক	৩৲
সমষ্টি	৩০৪৪।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬৩১৸৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৭৯১ ।৩
পুস্তকালয়	৬৸০
যন্ত্রালয়	৯৪৯ ।৯
গচ্ছিত	২৯৫/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬৪ ।৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	১৫০৲
দাতব্য	৮০৲
সমষ্টি	২৯৬৭৸৶০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ শ্রাবণ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

প্রাচীন ব্রহ্মবিৎ বলিয়াছেন "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"। "এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়॥" পরমাত্মাকে না জানিলে আমরা বিনাশ পাই, জানিলে আমরা জীবন পাই; এ জানা'র সঙ্গে অন্যান্য জানা'র সঙ্গে বিস্তর প্রভেদ। এ জানা উদাসীনের ন্যায় জানা নহে, কিন্তু প্রাণের বস্তুকে প্রাণের বস্তু করিয়া জানা। আর আর বিদ্যা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আত্মার তৃপ্তি-সাধনের জন্য। "অপরা ঋক্‌বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" জ্যোতিষ প্রভৃতি যত প্রকার লৌকিক এবং প্রাকৃতিক বিদ্যা আছে সমস্তই অপরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। ব্রহ্ম-বিদ্যাই জ্ঞানের অমৃত সোপান। আর আর বিদ্যা আমাদের সংসার নির্ব্বাহের অনেক সুবিধা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। আমাদের আদিম নিবাস-স্থানের—চরম গম্য স্থানের—সমাচার যেখানে জ্ঞানের জিজ্ঞাসা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সেখানে সম্মুখ-স্থিত পান্থশালার সমাচার আনিয়া দিয়াই নিরস্ত হয়। জ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে, আপনার প্রাণগত বিষয়ের যে-কোন সমাচার জিজ্ঞাসা করে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহার একটি কথারও উত্তর দিতে পারে না—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিতে গিয়া কেবল আপনার অক্ষমতারই পরিচয় প্রদান করে। বহির্বিষয়ের সংসর্গেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মুখে স্ফূর্ত্তি হয়, জ্ঞানের সংসর্গে তাহার মুখে কথা ফুটে না—তাহা মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করে। এ জন্য যাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অতিমাত্র পক্ষপাতী, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদের চক্ষের বিষ। জ্ঞান অসীম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরমাত্মার মহিমা অবলোকন করিতে চায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জ্ঞানকে সে দিকে তাকাইতে বারণ করে; কিন্তু জ্ঞান সে বারণ শুনে না। এই

জন্যই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এত বিবাদ। জ্ঞান চায় জীবন এবং প্রীতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহাকে আনিয়া দেয় মৃত্যু এবং বিষাদ; জ্ঞান তাহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? ঈশ্বর-প্রীতি এক দিকে যেমন অনন্ত জীবনের উৎস, আর এক দিকে তেমনি সেই জীবনের অমৃত উপজীবিকা; জ্ঞান কি এতই অজ্ঞান যে, সে সেই অক্ষয় অমৃত জীবন এবং তাহার চিরন্তন উপজীবিকা ছাড়িয়া মৃত্যুকে ভজনা করিবে, অনন্ত আকাশের ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া মৃত্তিকাকেই সার করিবে; ইহা অসম্ভব।

অপরা বিদ্যার মধ্যেও এমন সব দ্বার আছে, যাহার ভিতর দিয়া পরা বিদ্যার পথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ পণ্ডিতেরা সে সকল দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী ধ্রুব, মঙ্গল-প্রবণ, বিজ্ঞতার পরিচায়ক নিয়ম সকল কোথায় আরো পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপী ধ্রুব মঙ্গলময় জ্ঞানময় সত্তা এবং শক্তির জাজ্বল্যমান সাক্ষী বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহা নহে, ইদং-সর্ব্বস্ব তামসিক বিজ্ঞান সেই সমুজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে পেচক-পক্ষীর ন্যায় আপনার তমো-গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক পক্ষ ফুলাইয়া আস্ফালন করিতে থাকে। অতএব কেবল মাত্র অপরা বিদ্যার অনুশীলন অনর্থের মূল; শরীর মন এবং সংসারের জন্য যেমন অপরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়, আত্মার জন্য সেইরূপ পরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়।

সকল বিদ্যাই একদিকে যেমন তত্ত্ব-মুখী, আর এক দিকে তেমনি কার্য্যমুখী। জ্যোতিষ বিদ্যা একদিকে আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড তত্ত্ব সকল মনোমধ্যে জাগাইয়া তোলে, আর একদিকে সামুদ্রিক নৌকা-চালনায় নিয়োজিত হইয়া বাণিজ্যের সৌকর্য্য সাধন করে। রসায়ন বিদ্যা একদিকে যেমন জড়-জগতের ধাতু-প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল আবিষ্কার করে, আর একদিকে তেমনি ঔষধ নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যের সহায়তা করে। লোকে যেমন অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া উদাসীনকে ঘরে ফিরাইয়া আনে, মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞানের তত্ত্ব-সকলকে বাহির হইতে ঘরে আনিয়া তাহাকে সংসার-কার্য্যে দীক্ষিত করে।

অপরা বিদ্যার ন্যায় পরা বিদ্যাও একদিকে তত্ত্বমুখী আর একদিকে কার্য্যমুখী। পরা বিদ্যার তত্ত্ব-প্রধান অংশ আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহার কার্য্য-প্রধান অংশ আধ্যাত্ম-যোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের লাভালাভ, ইচ্ছানিচ্ছা, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিলে—শুদ্ধ কেবল সত্যের জন্য সত্যের অনুশীলন করিলে—সত্যের প্রতি আমাদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা হয়। নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্য যেমন সমধিক প্রত্যয়-ভাজন, নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা সেইরূপ সমধিক শ্রদ্ধেয়। কিন্তু জ্ঞানের কথাতে যদি আমাদের কোন কার্য্য না দর্শে, তবে তাহাতে আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি। এই জন্য, প্রীতিকে যেমন ঘর হইতে ক্রমে ক্রমে বাহিরে বিস্তার করা আবশ্যক, জ্ঞানকে তেমনি বাহির হইতে ক্রমে ক্রমে ঘরে আনা আবশ্যক। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরা সূর্য্য চন্দ্র মেঘ বিদ্যুৎ অগ্নি বায়ু নদী সমুদ্র পর্ব্বত অন্তরীক্ষ পৃথিবী হইতে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব আহরণ করিয়া অবশেষে আত্মার অন্তরতম প্রেম নিকেতন সেই পরম-তত্ত্বের অধিষ্ঠানের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি প্রত্যয়কে দৃঢ় করিবার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞানালোচনা করা যেমন আবশ্যক, তেমনি সত্যকে ঘরে পাইবার জন্য অন্তঃকরণের

স্পৃহাকে দিয়া সত্যকে আত্মার অভ্যন্তরে ধরিয়া আনা আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে, পরমাত্মা যেমন বাহিরে আছেন, তেমনি তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেও বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু প্রীতির অবিদ্যমানে ঘরের লোকও বাহিরের হইয়া যায়, প্রীতির আকর্ষণে বাহিরের লোকও ঘরের হইয়া দাঁড়ায়; প্রীতি অপ্রীতিই অন্তর-বাহিরের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। পরমাত্মা যাহার যত প্রিয় তাহার তত নিকটে বর্ত্তমান, যাহার যত অপ্রিয় তাহা হইতে তত দূরে বর্ত্তমান। জ্ঞান সাধারণতঃ বলিতেছে যে, পরমাত্মা সকলেরই অন্তরতম আত্মা, প্রেম বিশেষ করিয়া বলিতেছে যে, যাঁহার তিনি প্রিয়তম তাঁহারই তিনি অন্তরতম। অতএব প্রেমের পথই পরমাত্মাকে অন্তরে আনিবার একমাত্র পথ। যদিচ নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইহা আমরা স্থির জানিতেছি যে, পরমাত্মা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন, তাহা হইলেও এমন হইতে পারে যে, তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন; অতএব জ্ঞানের ধ্রুব সত্যের প্রতি মনকে সেইরূপে নিবিষ্ট করা আবশ্যক—যাহাতে সেই সত্যের আকর্ষণ আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে; যাহাতে আমাদের সুবিমল প্রীতি প্রত্যুত্থান করিয়া সেই জীবন্ত সত্যকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন পরমাত্মার প্রতি আমাদের প্রত্যয়কে অচলের ন্যায় দৃঢ় করে, এই তাহার মহৎ ফল; অধ্যাত্ম-যোগ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আত্মার আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয় ও আত্মার সমস্ত অভাব মোচন করে, এই তাহার মঙ্গলময় ফল; একটিকে ছাড়িয়া আর একটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না—উভয়ের যোগেই উভয়ে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। জ্ঞানের প্রত্যয় মূলধন স্বরূপ, এবং প্রেমের আদান-প্রদান আয়-ব্যয় স্বরূপ, উভয়ের কোন-টিই উপেক্ষণীয় নহে।

ইহা যেমন ধ্রুব সত্য যে, আমাদের আত্মা অপূর্ণ, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য যে, পরমাত্মা পরিপূর্ণ; তাহা যদি হইল তবে আমাদের সাধনা-কার্য্য যে কি তাহা আর আমাদের নিকট অগোচর থাকিতে পারে না; সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা যিনি আমাদের জ্ঞানে ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা, তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বিন্দু দ্বারা আত্মার সমস্ত অভাব মোচন করা—ইহাই আমাদের সাধনা। ঈশ্বরারাধনা এই সাধনার নিয়মিত প্রবাহ, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান এই সাধনার বিধরণ-সেতু, এবং অধ্যাত্ম-যোগ এই সাধনার ঘনীভূত স্রোতঃ-সঙ্গম। আমাদের ভাগ্যে যদি কখনও এরূপ শুভযোগ উপস্থিত হয় যে, আমাদের প্রত্যয় এবং স্পৃহা, জ্ঞান এবং প্রেম, মন এবং প্রাণ সমস্তই অমৃত-সাগর পরমাত্মাতে একতানে সম্মিলিত হইয়াছে—তবে সেই শুভ-যোগই প্রকৃত অধ্যাত্ম-যোগ। অধ্যাত্ম-যোগের সুনিস্তব্ধ শান্তি এবং সুকোমল প্রেমে অবগাহন করিয়া সাধক যখন উত্থান করেন, তখন তিনি ঈশ্বর-প্রসাদে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, নূতন চক্ষু—নূতন আনন্দ—নূতন জীবন—পাইয়া, আপাদ মস্তক সবাহ্যাভ্যন্তর নূতন হইয়া উত্থান করেন; তখন

"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা-গ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

তিনি আনন্দনীয় পরমাত্মাকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ

হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।”

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার,—তুমি সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান, মঙ্গলের মধ্যে বর্ত্তমান, সত্যের মধ্যে বর্ত্তমান—সকল সত্তাতে, সকল শক্তিতে, সকল কার্য্যেতে তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি ভিতর হইতে প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের আবরণ তাহাকে গোপন করিতে পরাভব মানিতেছে। তোমার সৌন্দর্য্য যাহাতে আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে, সেই সুবিমল প্রেমের উৎস আমাদের হৃদয়ে উন্মুক্ত করিয়া দেও; তুমি আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর, আমরা তোমার চরণে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক করি; তুমি কৃপা করিয়া ভক্ত হৃদয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

এই সংহিতার তিনটি মুখ্য খণ্ড।

দর্শন-সংহিতা তিনটি মুখ্য খণ্ডে বিভক্ত। এই যে ভাগ-বিন্যাস ইহার ব্যাপ্তিমত্তা এবং ব্যবহার-সৌকর্য্য কেবল নহে কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবিতা এবং বিকল্প-শূন্যতা প্রদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তত্ত্ব-জ্ঞানক্ষেত্রে কিছুই কাহারো স্বেচ্ছাধীন বিবেচনার উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে না। জিজ্ঞাসুর সমুদায় বিন্যাস-ব্যবস্থা, এমন কি প্রত্যেক পদক্ষেপ, অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়া চাই—কিছুই যদৃচ্ছা-মূলক হইলে চলিবে না। সে বিন্যাস-ব্যবস্থা লক্ষ্য-বস্তুর নিজ-কর্ত্তৃক নিয়মিত এবং প্রবর্ত্তিত হইবে, লক্ষয়িতার দৃষ্টি-পদ্ধতি তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।* এজন্য

---

* যেরূপ তত্ত্ব-নির্ণয়-প্রণালী লক্ষ্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, বেদান্ত-দর্শনে তাহা বস্তু-তন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা:—

“নতু বস্তু এবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনা তু পুরুষ-বুদ্ধ্যপেক্ষা, ন তু বস্তু-যাথাত্ম্য-জ্ঞানং পুরুষ-বুদ্ধ্যপেক্ষং; কিং তর্হি? বস্তু-তন্ত্রমেব তৎ॥ নহি স্থাণৌ একস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বেতি তত্ত্ব-জ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বা ঽন্যোবেতি মিথ্যা জ্ঞানং, স্থাণু রেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবম্ভূতবস্তু-বিষয়ানাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রং।” ইহার অর্থ;—

বস্তু কিন্তু—“এ প্রকার নহে” কিম্বা “নাই” বলিয়া বিকল্পিত হয় না। বিকল্পনা পুরুষ-বুদ্ধিকে (e. i. Judgement based upon personal considerations) অপেক্ষা করে, বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান পুরুষ-বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না,—ইহাই বস্তুতন্ত্র। একটা বৃষকাষ্ঠকে “হয় তো বৃষ কাষ্ঠ, নয় পুরুষ, নয় অন্য-কিছু” এরূপ করিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান নহে। বৃষ-কাষ্ঠকে পুরুষ বা অন্য-কিছু বলিয়া জানা মিথ্যা-জ্ঞান, তাহাকে বৃষ-কাষ্ঠ বলিয়া জানা-ই তত্ত্বজ্ঞান; যেহেতু এ জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র। নির্দ্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত বস্তু-সকলের নিশ্চয়তা বস্তু-তন্ত্র।

বস্তু-তন্ত্র—অর্থাৎ অপৌরুষেয়। যাহা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে তাহাই অপৌরুষেয় (Impersonal)। এই সুযোগে তত্ত্ব-জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করি। তত্ত্ব-শব্দের মূল অর্থ-টি এখানে বিবেচ্য। তত্ত্ব কি? না তাহা-ত্ব—যে যাহা তাহার তাহা-ত্ব; যেমন—ঘটের ঘটত্ব—পটের পটত্ব—ইত্যাদি। ঘটের পক্ষে যে-রূপ লক্ষণ না হইলেই নয় (যেমন উদর-দেশের আপেক্ষিক স্থূলতা ও গল-দেশের আপেক্ষিক কৃশতা ইত্যাদি) তাহার নিরূপণই ঘটের তত্ত্ব নিরূপণ। যাঁহারা ইয়োরোপীয় নৈয়ায়িক ভাষার সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তত্ত্ব কি—না Universal proposition. কি না সার্ব্বভৌমিক এবং নির্বিকল্প সিদ্ধান্ত। তত্ত্বেরই (অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক সত্যেরই) প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ; কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলে Paraticular proposition—অর্থাৎ স্থূল-তত্ত্ব বা আংশিক তত্ত্ব যাহা কোন স্থলে বা খাটে—কোন স্থলে বা খাটে না—তাহার প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ নহে। “কোন কোন মনুষ্য বৃদ্ধ” এই কথা এবং “কোন কোন মনুষ্য বৃদ্ধ নহে” এই কথা—এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী নহে, কেন না দুইই এক সঙ্গে সত্য হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু “মনুষ্য জীব-বিশেষ” এই কথা, এবং “মনুষ্য জীব নহে” এই কথা, এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। এ জন্য “মনুষ্য জীব” ইহা যেমন মনুষ্য-বিষয়ক একটি তত্ত্ব, “মনুষ্য বৃদ্ধ” ইহা সেরূপ নহে; কেন না শেষোক্তের বিকল্প সম্ভবে—মনুষ্য যুবা হইলেও হইতে পারে। কতক-গুলি তত্ত্ব লৌকিক মাত্র, অর্থাৎ লোকে তাহাদিগকে তত্ত্ব বলিয়া

এখানে যেরূপ ভাগ-বিন্যাসের প্রস্তাব হইতেছে তাহার মুখ্য অবয়বটির প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই ; তবে তাহার বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরবর্ত্তী তত্ত্ববিৎদিগের হস্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারে—হয় হউক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ-টি বহুতর ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। নিম্নের নয়-টি পরিচ্ছেদে ইহার সবিশেষ বিবরণ আনুপূর্ব্বিক প্রকাশিত হইল ; তদ্দৃষ্টে এই গ্রন্থের সাধারণ খণ্ড-বিভাগ এবং তাহার ক্রম-পদ্ধতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

অস্তিতত্ত্ব প্রথম-কল্প, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা চরম-কল্প।

মূলতত্ত্ব-সকলের—চরমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝাই যাইতেছে যে, এ সংহিতা এমনি একটি বিজ্ঞান-ব্যাপার, যাহা স্বীয় উল্টা-পিট সম্মুখে করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। এ'র মধ্যে কঠিন হ'চ্চে—প্রকাণ্ড যন্ত্রটাকে এরূপ করিয়া ঘুরাইয়া রাখা যাহাতে তাহার সোজা পিট আমাদের সম্মুখে আইসে। কি সে উল্টা পিট—যাহা প্রথমেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং যাহাকে উল্টাইয়া রাখা আবশ্যক ? প্রশ্ন-আকারে বলিতে হইলে সেটি এই যে—সত্য কি ? স্বরূপতঃ এটি চরম প্রশ্ন, কিন্তু আমাদের কাছে উহা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন। ঐ প্রশ্নের অব্যবহিত উত্তর যাহা ঐ প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সমস্ত কাণ্ড-টি উল্টাইয়া দেয়, তাহা এই ;—যাহা আছে তাহাই সত্য।* যাহা সম্যক্ রূপে আছে তাহাই সত্য। ইহাতে আর সংশয় নাই। এই উত্তর সদ্য আর একটি প্রশ্ন টানিয়া আনে, সে-টি এই,—কিন্তু কি আছে ? এ প্রশ্ন আপাততঃ, স্তোক-বাক্য ভিন্ন, প্রকৃত উত্তর পাইতে পারে না। এ উত্তরের এখনো পালা আসে নাই। ইহাকে অবসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ভূগোল-যন্ত্রের পশ্চাৎ-দ্রষ্টব্য প্রদেশের ন্যায় আপাততঃ ইহাকে সম্মুখ-হইতে ঘুরাইয়া রাখিতে হইবে, অথবা পশ্চাৎ পরিধেয় পরিচ্ছদের ন্যায় আপাততঃ ইহাকে খুলিয়া রাখিতে

থামিয়া নয় এই পর্য্যন্ত,—ইহার একটি দৃষ্টান্ত—জড়পিণ্ড মাত্রেরই গুরুত্ব আছে ; পৃথিবীর কেন্দ্র-স্থানে কোন বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না (অর্থাৎ যে বস্তুর ভার-কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপিত হয় সে-বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না) ইহা বিজ্ঞানের স্থির-সিদ্ধান্ত। অতএব আসল ধরিতে গেলে "জড়-পিণ্ড-মাত্রেরই গুরুত্ব আছে" ইহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা-পথ একের অধিক হইতে পারে না—এটি নিতান্ত পক্ষেই তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য, কেন না মূলেই ইহার বিকল্প সম্ভবে না। যে জ্ঞানের বিকল্প সম্ভবে আমাদের শাস্ত্রানুসারে তাহা তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। অবশ্যম্ভাবী সত্যের জ্ঞান—যাহার কোন কালেই একটুও নড় চড় হইতে পারে না—তাহাই তত্ত্ব-জ্ঞান, সুতরাং তাহ পুরুষ-তন্ত্র নহে (অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে) কিন্তু বস্তু-তন্ত্র। ফরাসীস্ দেশীয় তত্ত্ববিৎ কুজান্ এইটি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান বস্তু-তন্ত্র, অথবা যাহা একই কথা—তত্ত্বজ্ঞান অপৌরুষেয়। কাণ্ট্ এইটি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান সার্ব্বভৌমিক এবং অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান গ্রন্থে বিশেষ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ত্ত। একই কথা। তত্ত্ব-জ্ঞান-শব্দের মুখ্য অর্থ এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে ; তত্ত্বের (অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী সার্ব্বভৌমিক অপৌরুষেয় এবং নির্বিকল্প সত্যের) জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান (Reason) ; এবং ঐ প্রকার সত্য যে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় তাহাই দর্শন-শাস্ত্র বা তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্র (Metaphysics)।

* অর্থাৎ সত্তাই সত্যের পরিচায়ক। সৎ কি ? না যাহা চিরকাল বর্ত্তমান। সত্তা কি ? না চিরন্তন বর্ত্তমানতা। যাহা সম্যক্‌রূপে আছে—অর্থাৎ যাহা কোন কালে "নাই" হইবার নহে, তাহাই সম্যক্ সত্য। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে-ও সত্তা (কি না নিত্য অস্তিত্ব) সত্যের পরিচয়-চিহ্ন। সত্য কি ? এ প্রশ্ন এখন ঠেলিয়া রাখিয়া—সত্তা কি—এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। সত্য হ'চ্চে ধর্ম্মী—সত্তা হ'চ্চে তাহার ধর্ম্ম ; লক্ষ্য বস্তুর ধর্ম্ম-নিরূপণই জ্ঞানের প্রথম কার্য্য ; এ জন্য, সত্তা কি—ইহাই প্রথম জিজ্ঞাসা,—ইহার মীমাংসার উপরেই "সত্য কি" ইহার মীমাংসা নির্ভর করে।

হইবে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্থাপনা তত্ত্ব-জ্ঞানের একটি সুবিস্তীর্ণ খণ্ড আনিয়া দাঁড় করাইতেছে, সে খণ্ডটির উদ্দেশ্য হ'চ্চে—বাস্তবিক সত্তা কি—সমীচীন অস্তিত্ব কি—তাহার সিদ্ধান্ত-মীমাংসা। এ খণ্ড-টি অস্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আছে কি তদ্বিষয়ক, সিদ্ধান্ত-মীমাংসা।

জ্ঞান-তত্ত্ব স্বভাবতঃ যদিও চরম, কিন্তু তত্ত্বতঃ
তাহাই প্রথম; অতএব তাহাকে পশ্চাৎ হইতে
সম্মুখে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কাজ এই—যেমন ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মীমাংসা প্রশ্নের সমস্ত দলবলকে এরূপ করিয়া উল্টাইয়া রাখা, যাহাতে প্রথমটি চরমে পড়ে ও চরমটি প্রথমে আইসে; এটি করিতে হইলে এমনি সব উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক, যাহা প্রশ্ন গুলির মীমাংসায় আপাততঃ হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। ঘূর্ণন-গতিকে—স্বভাবতঃ যাহা চরমে পড়িয়া থাকে তাহা যখন প্রথমে আনীত হইবে, এবং স্বভাবতঃ যাহা প্রথমে আসে তাহা চরমে নিক্ষিপ্ত হইবে—তখনই তাহাদের মীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে। কারণ, যে-সকল প্রশ্ন অগ্রে বিচার্য্য তাহারা স্বতন্ত্র, ও যাহারা স্বভাবতঃ অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহারা স্বতন্ত্র; দুয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ যে, শেষোক্তের মীমাংসার সমুদায় মূল-উপাদান পূর্ব্বোক্তের মধ্যে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; কাজেই, পূর্ব্বোক্তের বিচার-কার্য্য অগ্রে চুকাইয়া না দিয়া শেষোক্ত-গুলিকে সম্মুখে আসিতে দেওয়া হইতে পারে না। প্রত্যেক উত্তর এরূপ হওয়া চাই যে, এক-দিকে যেমন তাহা পূর্ব্ব প্রশ্নকে প্রতিহত করিবে, আর-এক দিকে তেমনি নূতন একটি প্রশ্নকে সম্মুখে আনয়ন করিবে। অস্তি-তত্ত্বের মীমাংসা ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল, যথা;—প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই যে, কি আছে? আর, তাহাকে ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর এই—যাহা জ্ঞানে বিদ্যমান তাহাই আছে। কিন্তু এ উত্তর একদিকে যেমন অস্তি-তত্ত্বকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেয়, অমনি আর এক দিকে নূতন একটি প্রশ্ন (বা প্রশ্নাংশ) আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে; সেটি এই, জ্ঞানে কি বিদ্যমান আছে? জ্ঞান কি?* এইরূপ প্রক্রিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি সমগ্র খণ্ড আনিয়া দাঁড় করায়; ফলে, এইখানেই ঘূর্ণনের পরিসমাপ্তি; অন্ততঃ, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রথম প্রশ্ন কি তাহা খুঁজিয়া পাইলেই আমরা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত আরম্ভ-স্থান—নিকটতম জিজ্ঞাস্য বিষয়—হস্তে পাই। এই খণ্ডটি জ্ঞান-জ্ঞেয়ের মূল নিয়ম-গুলির অনুসন্ধানে এবং ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত। তাহাতে একদিকে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, সে গুলি সমস্ত জ্ঞানেরই নিয়ম, সমস্ত চিন্তারই নিয়ম; আর-এক দিকে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি আগন্তুক নিয়ম, সে-গুলি শুদ্ধ কেবল আমাদেরই জ্ঞানের নিয়ম—আমাদেরই চিন্তার নিয়ম। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বর্ত্তমান বিভাগ জ্ঞান-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ; অস্তি-তত্ত্ব যেমন অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক, জ্ঞান-তত্ত্ব সেইরূপ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক। জ্ঞান কি এবং জ্ঞেয় কি, এক কথায়—জ্ঞান কি, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান ইহার কার্য্য। এই

---

* সত্য চরম লক্ষ্য; তাহার অনুসন্ধানে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়া, সত্যের ভাব যাহা আমাদের অনুভব-গম্য, কি না সত্তা—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য; আবার সত্তার অনুসন্ধানে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়া, সত্তার সাক্ষী যাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশমান—কি না জ্ঞান স্বয়ং—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। অতএব, সত্য অপেক্ষা সত্তা এবং সত্তা অপেক্ষা জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী সুতরাং অগ্রে বিবেচ্য।

খণ্ডটি যে-পর্য্যন্ত না সম্যক্‌রূপে বিচারিত হইতেছে, সে-পর্য্যন্ত অস্তি-তত্ত্বের নিকটে যাইতে—এমন কি তাহার দিক্ পানে তাকাইতে—নিষেধ।

জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অস্তি-তত্ত্ব এই দুইটিই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য খণ্ড।

জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অস্তি-তত্ত্ব এই দুইটিই তবে তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রধান দুইটি শাখা। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কি আমরা জানি—এটি যতক্ষণ না আমরা স্থির করিতে পারিতেছি, অথবা যাহা একই কথা—যতক্ষণ না আমরা সম্যক্ তন্ত্র-সম্বদ্ধ জ্ঞান-তত্ত্বের সমস্ত বিবরণ নিঃশেষিত করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ-কি আছে—ইহার মীমাংসায় আমাদের অধিকার জন্মিতে পারে না, অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ আমরা অস্তি-তত্ত্বে প্রবেশ পাইতে পারি না। তখনও অস্তি-তত্ত্বে প্রবেশ পাই কিনা—তাহাও সন্দেহ। যাহাই হউক্ না—জ্ঞান-তত্ত্বের মীমাংসার দ্বার অতিবাহন না করিয়া আমরা সমীচীন অস্তি-তত্ত্বে পৌঁছিতে পারি না। কারণ, কি আছে তাহা অগ্রে আমরা জানিব—তবে তো তাহা কথায় ব্যক্ত করিব, তাহা জানিতে অন্ততঃ চেষ্টা করা চাই—নহিলে আমরা তাহা বলিতে অধিকারী হই না; আবার যতক্ষণ আমরা—'জানা' কাহাকে বলে, জ্ঞান কি, জ্ঞান-ক্রিয়া এবং জ্ঞেয়-বিষয় কি, এই প্রশ্নের সম্যক্ পরীক্ষা এবং মীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ—কি আছে—তাহা আমরা জানিতেও অধিকারী হই না। এই সব প্রশ্নের যে পর্য্যন্ত না উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত—এ কথা বলা কোন কার্য্যেরই নহে যে, জ্ঞানে যাহা বিদ্যমান তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব।

জ্ঞান তত্ত্ব স্বতঃ অস্তি-তত্ত্বের প্রবেশ-দ্বার হইতে পারে না কেন।

কিন্তু জ্ঞান-তত্ত্বের প্রশ্ন-মীমাংসা সমাপ্ত হইবার পরেও—জ্ঞানের সমস্ত নিয়ম আবিষ্কৃত এবং প্রদর্শিত হইবার পরেও—কি আছে এই প্রশ্ন হস্তে লইতে এবং তাহার মীমাংসা করিতে আমরা কি এক তিলও বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই? একটু বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই বটে,—কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; কথাটি সহজ নহে, তাহা অস্তি-তত্ত্বের পথ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে, সে-টি এই;—

হইতে পারে—যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব।

এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব। আমাদের অজ্ঞান আত্যন্তিক প্রগাঢ়—আমাদের জ্ঞান-অপেক্ষা তাহা বহু-পরিমাণে বিস্তীর্ণ। ইহাতে আর কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। অস্তি-তত্ত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে থাকে, তবে আমরা জ্ঞান-তত্ত্বকে হাতে পাইলেই অস্তি-তত্ত্বকেও সেই সঙ্গে হাতে পাই; ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে যদি রত্ন থাকে, তবে ভাণ্ডার আমাদের হস্তগত হইলেই রত্নও আমাদের হস্তগত হয়; কিন্তু অস্তি-তত্ত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে মূলেই অবস্থিতি না করে, তাহা হইলে জ্ঞান-তত্ত্ব শূন্য-ভাণ্ডার মাত্র—তাহা আমাদের হস্তগত হইলেই বা কি, আর, না হইলেই বা কি। মনে কর, জ্ঞানের অর্থ, তাহার যাহা নহিলে হয়, তাহার সীমা, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা, সমস্তই আমরা স্থির-স্থার করিয়া বসিয়া আছি, তাহা হইলেও এরূপ হইতে পারে—হইতে পারে কেন—হওয়াই সম্ভব যে, সম্যক্ অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের সীমা

অতিক্রম করিয়া আমাদের অজ্ঞানের প্রাচীরের আড়ালে পলাইয়া রহিয়াছে। কি আছে—এ সম্বন্ধে হয় তো আমরা কিছুই জানি না সুতরাং কিছুই বলিতে পারি না। আমাদের অগ্রসর হইবার পথে এটি একটি ঘোরতর প্রতিবন্ধক। ফলে এইটিই এযাবৎকাল সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে ধরাশায়ী করিয়া আসিতেছে; অস্তিত্বের আজ-পর্য্যন্ত-অভেদ্য অলঙ্ঘ্য-প্রায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যখন যে কেহ পা বাড়াইয়াছে—উহাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ হটাইয়া দিয়াছে। অতএব এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করা পরামর্শ-সিদ্ধ।

এই বিবেচনা অজ্ঞান-তত্ত্ব নামক তত্ত্ব-জ্ঞানের আর-একটি খণ্ড আনিয়া দিতেছে।

আমাদের অজ্ঞানের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অথবা তাহার প্রতি চক্ষু নিমীলন করিয়া নহে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাতে চোখোচোখি করিয়া, ঐ দুস্তর প্রতিবন্ধকটি অতিক্রম করিতে হইবে; আর চোখোচোখি করিবার এক যা উপায় তা এই,—তাহার প্রকৃতির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান-প্রয়োগ। অজ্ঞান কি—কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাই বা জ্ঞান থাকিতে পারে না—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং স্থিররূপে অবধারণ করা আবশ্যক। এইরূপে, সম্পূর্ণ নূতন একটা বিষয়ের অনুসন্ধান আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে; ইহার নাম অজ্ঞান-তত্ত্ব এবং ইহাতেই এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ড পর্য্যবসিত। এই অনুসন্ধানের ফল সংহিতার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এখন অস্তি-তত্ত্বের প্রশ্ন বিবেচিত হইতে পারে।

এখন আমাদের গন্তব্য পথ আমাদের সম্মুখে দিব্য পরিষ্কার এবং সোজা দেখা দিতেছে। জ্ঞানে কি জানা যাইতে পারে—জ্ঞান-তত্ত্ব তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। জ্ঞানে কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে—অজ্ঞান-তত্ত্ব তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। সমীচীন অস্তিত্ব—হয় আমাদের জ্ঞানে বিদ্যমান—নয় আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যমান, দুয়ের এক; সুতরাং হয় তাহা জ্ঞান-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের সহিত—নয় অজ্ঞান-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের সহিত—সম-তানে মিলিয়া যাইবে (পরে আমরা প্রমাণ করিব যে, জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব এই দুই বিপরীত পক্ষের এক-তমের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই)। কিন্তু যদি জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব উভয়েরই চরম সিদ্ধান্ত একই হইয়া দাঁড়ায় (পরে দেখা যাইবে যে, ফলে তাহাই হইয়াছে) তবে, সমীচীন অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের গোচরই হউক আর অগোচরই হউক, তাহাতে আমাদের কিছুই আসিবে যাইবে না। উভয় পক্ষেই আমরা সমীচীন অস্তিত্বের পরিচয়-লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিয়া তাহাকে আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে পারিব; তাহার গাত্রে আমরা একটা বিশেষণ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিব—তাহা হইলেই হইল। তত্ত্ব-জ্ঞানের এক যা চরম দান—যাহা দিবার জন্য সে জন-সাধারণের নিকটে প্রতিশ্রুত—তাহা ঐ বিশেষণ-দান। অস্তি-তত্ত্বে সমস্তই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে—এখানে তাহার চরম মীমাংসা পূর্ব্বাহ্ণে বিবৃত করিয়া তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়োজন করে না। এখানে এইটুকু কেবল বলা যাইতে পারে যে, কি আছে—এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম প্রশ্ন পরিষ্কার-রূপে মীমাংসিত হইয়া যায়; সেই চরম প্রশ্নটি—যাহা দেখা দিতে সর্ব্ব প্রথমেই দেখা দেয় ও যাহার মূল উপাদান-সকল আমাদের হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া রাখিতে হয়—তাহা এই,—সত্য কি?

খণ্ড-ত্রয়ের পুনরাবৃত্তি।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে কেবল এইটি পুনরুক্তি করিবার অপেক্ষা যে, তত্ত্বজ্ঞান তিন খণ্ডে বিভক্ত,—প্রথম, জ্ঞান-তত্ত্ব; দ্বিতীয়, অজ্ঞান-তত্ত্ব; তৃতীয়, অস্তি-তত্ত্ব। এই যে ভাগ-বিন্যাসের ব্যবস্থা, ইহা ব্যক্তি-বিশেষের রুচি অথবা মনোরথ অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ঐরূপ ভাগ-বিন্যাস ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই বলিয়াই—আর-কোনরূপ ক্রম-পদ্ধতি তত্ত্বজ্ঞানের প্রশ্ন-সকলের সহিত সংলগ্ন হয় না বলিয়াই—তত্ত্বজ্ঞানকে উহার অনুবর্ত্তী হইতে হইতেছে।

খণ্ডত্রয়ের পার্থক্য-রক্ষা প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত-প্রকার ভিন্ন অন্য যে-কোন প্রকার খণ্ড-বিভাগ যখনই করিতে যাওয়া হয়, তখনই কি-যে গোলোযোগ উপস্থিত হয় তাহা আর বলা যায় না,—তখন মৃতকল্প গতি-স্তম্ভ যাহা ঘটে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া ভার। এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, জ্ঞান-তত্ত্বের (অর্থাৎ জ্ঞান এবং তাহার নিয়মাবলী বিষয়ক প্রশ্ন সকলের) মীমাংসা সুসম্পন্ন হইতে-না-হইতেই অস্তি-তত্ত্বের প্রশ্ন-মীমাংসা হস্তে লইবার এবং অস্তিত্ব-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার যে, একটা অভ্যাস, যাহাকে প্রায়শই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে—কখনই রীতিমত দমন করা হয় না, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সমস্ত গোলোযোগের মূল। তত্ত্বজ্ঞানের গতিরোধক কারণের বিষয় যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—এ কেবল তাহারই একটা অঙ্গ বা ফল; গতিরোধক কারণ সে—আর কিছু নয়—মূল ডিঙাইয়া অন্তে উপনীত হইতে যাওয়া। বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ বিপরীত পদ্ধতির বিষময় ফলের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষে পড়িবে। অতএব এইটির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, অস্তিত্ব বিষয়ক যে-কোন প্রশ্নই হউক্—আর যে-কোন মতই হউক্—সমস্তই জ্ঞান-তত্ত্ব স্বীয় বিবেচনা হইতে বল-পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। জ্ঞান-তত্ত্ব কেবল জ্ঞান এবং জ্ঞেয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিবে।

এই তিন খণ্ডে স্বাভাবিক অনবধানতার সংশোধন।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য, প্রবর্ত্তক কারণ এবং প্রকরণ-পদ্ধতি, এ-তিনটি বিষয়ের সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইল তদুপলক্ষে সাধারণতঃ—এবং বর্ত্তমান গ্রন্থের পরিচয়-লক্ষণ ও সবিশেষ বিবরণ যাহা প্রদর্শিত হইল তদুপলক্ষে বিশেষতঃ—এখনো এমন একটি কথা বলিবার আছে যাহা স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ অধিকার করিবার উপযুক্ত; সেটি এই,—তন্ত্র খানির প্রত্যেক খণ্ডের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত স্বাভাবিক চিন্তা-সুলভ অনবধানতার সংশোধন-কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, জ্ঞান-তত্ত্বে তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, অজ্ঞান-তত্ত্বে তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর, অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, অস্তি-তত্ত্বে তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই তন্ত্রের সিদ্ধান্ত-সকল সর্ব্বদা মনে বিদ্যমান থাকে না, এই আপত্তি উপলক্ষে মন্তব্য।

আর একটি কথা আছে; কথা-টি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই বলিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইতে পারেন যে, এই তন্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত-গুলি এতই যদি সত্য, তবে সে সিদ্ধান্ত-গুলি—সত্যের পক্ষে যেমন-টি হওয়া প্রার্থনীয়—তেমন প্রবল-রূপে

এবং জীবন্ত-রূপে মনোমধ্যে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে না কেন? ফলে, লৌকিক ব্যবহার-সুলভ মনোবৃত্তি—যাহা প্রায়শই মনুষ্য-জীবনের এক শত অংশের নিরেনব্বই অংশ অধিকার করে—তাহা যতক্ষণ-ধরিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ তো ও-সব সিদ্ধান্ত কাহারো মনে স্থান পায় না। ইহাঁর প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহাদের সর্ব্বক্ষণ মনোমধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রার্থনীয়ও নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে। ঐ সিদ্ধান্ত-গুলি যদি তাঁহার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক থাকে, তবে তাহাদের উপদ্রবে তাঁহার লোক-সমাজে তিষ্ঠনো ভার হয়, তাহা হইলে তিনি আপনার এবং অন্যের নিকটে বিষম এক জঞ্জাল হইয়া দাঁড়ান। এক-দিকে যেমন, সামান্য কাজ-কর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিবার সময় আপনার বা অন্যের চক্ষের সমক্ষে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত লইয়া ক্রমাগত নাড়া চাড়া করা অতীব অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন; আর-এক দিকে তেমনি, বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময় লৌকিক-সিদ্ধান্ত সুলভ সত্যাভাস-সকল—বৈটকখানা এবং হাট-ঘাটের বিধি-ব্যবস্থা সকল—শিরোধার্য্য করিয়া চলা অতীব অপকৃষ্ট শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা-প্রদর্শন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং লৌকিক সিদ্ধান্ত উভয়কে পরস্পরের সংসর্গ হইতে চির-বিযুক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সম্মুখে যাহা বিন্যস্ত হইতেছে, তাহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করাই এখানে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন; তদ্ব্যতীত তাহা তাঁহার মনে ধরিল কি ধরিল না, এ কথা এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাঁহার জ্ঞানই এখানে সর্ব্বস্ব তাঁহার হৃদ্গ্রহের অভাব এখানে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; আর সেই হৃদ্গ্রহের অভাব যদি এখানকার কোন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আইসে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত না করাই বিধেয়। সত্যের আশ্চর্য্য রহস্য উদ্গীরণের সঙ্গে আমরা আমাদের মনোবৃত্তি-সকলকে সর্ব্বদা সমুন্নত রাখিতে পারি না বলিয়া, সেই অপরাধে আমরা যদি সত্যকে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে দিই, তবে তাহাতে সত্যের মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের অতি অল্পই শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, আর, সত্যের গতিও তেমনি হয়। সত্যকে মনুষ্যের যৎসামান্য রাগ-দ্বেষাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না। আমাদের মন সর্ব্বদাই অথবা প্রায়শই সত্যের 'মহৎ পরামর্শের উচ্চ শিখরের' সমযোগ্য পদবীতে আরূঢ় থাকে না বলিয়া সত্যের প্রতি সন্দিহান হওয়া লোকের একরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা সংশয়-বাদের কিছু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সত্যের গভীরতম রহস্যের ভিতর তলাইতে পারে না—যদি পারে তবে সে ক্বচিৎ কদাচিৎ যুগ-যুগান্তর-ব্যবধানে—আর তা'ও অনেক সাধ্য-সাধনায়, এই কারণে অনেক তত্ত্ববিৎ, এবং তা' ছাড়া আরো অনেকে, সত্যকে সত্য-সত্যই অসত্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া থাকেন। অন্যান্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বেলা আমরা তো তাহাদের প্রমণীকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল জানিয়াই পরিতুষ্ট হই, সেগুলিকে অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার তো কোন প্রয়োজনই অনুভব করি না; দর্শন-শাস্ত্রের বেলা আমরা সেরূপ না করি কেন? শুদ্ধ কেবল দর্শন-শাস্ত্রের বেলা লোকে এইরূপ মনে করিতে খুব তৎপর যে, সত্যকে হৃদয়ে মূর্ত্তিমান করিতে—সত্যকে তাঁহাদের ঘরাও বিশ্বাসের ঘর-কন্নার প্রাচীরের মধ্যে আনিতে—তাঁহারা যখন অক্ষম, তখন-আর সত্যের পক্ষ

কিছুতেই রক্ষা পায় না; তাঁহাদের আপনাদের অক্ষমতার অপরাধে সত্য যেন বড়ই অপরাধী। কিন্তু লোকের ঐরূপ অক্ষমতা একটা আগন্তুক ঘটনা-মাত্র—তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। লোকে যদি মনে করে যে, সত্য তাহাদের প্রাকৃত মত-সকলের বিচারাধীন—সত্য তাহাদের অষ্টপ্রহর-সুলভ বুদ্ধির বাদ-বিতণ্ডায় একটুও বিচলিত হয়, কিম্বা এ যদি মনে করে যে, তাহাদের যথাভ্যস্ত চিন্তার পৃথিবী-সম্ভূত ক্ষণ-স্থায়ী উল্কা-সকল—যাহা সত্যের প্রকাণ্ড পরিক্রমণ-পথ ক্রমাগতই কাটাকাটি করে কিন্তু কখনই একটুও নড়াইতে পারে না—সেই সব ক্ষণ-স্থায়ী উল্কার সংঘর্ষে সত্য এক তিলও স্থানচ্যুত হয়, এরূপ মনে করিলে সত্যের প্রতি তাহাদের অতি অল্পই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

উপরের প্রবাহ।

নিম্নলিখিত বিষয়টি এখানকার ঠিক্ উপযোগী। পৃথিবী এবং তাহার যাহা কিছু আছে সমস্তই আকাশের মধ্য দিয়া অতিমাত্র প্রভূত বেগে ধাবমান হইতেছে। আমরা জ্ঞানে জানি যে, তাহাই ঠিক, কিন্তু সেটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; হৃদয়ঙ্গম করিবার বেলায় আমরা তাহার বিপরীত-টাই হৃদয়ঙ্গম করি। বিজ্ঞানের সহস্র কথা ঠেলিয়া (অন্ততঃ আমাদের সুখাসীন অবস্থায়) আমরা মনে করি যে, আমরা অটল স্থির রহিয়াছি; এ বিশ্বাস—প্রগাঢ় চিন্তা-শীল জ্যোতি-র্বেত্তা—যিনি সুখস্পর্শ পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণ—তাঁহারও যেমন, আর, একজন মূর্খ কৃষক যে খড়ের গাদায় হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহারও তেমনি, উভয়েরই সমান। জ্যোতির্ব্বেত্তা সকল-সময়েই কিছু-আর জ্যোতির্ব্বেত্তা থাকেন না। যখন তিনি তাঁহার মান-মন্দির হইতে নাবিয়া আসেন, তখন তিনি তাঁহার আঁক জোঁক, সিদ্ধান্ত মীমাংসা, সমস্তই পশ্চাতে ফেলিয়া-থুইয়া আসেন। তখন, তাঁহার সে-সব কার্য্য হইয়া চুকিয়াছে—অন্ততঃ কতক কালের জন্য। তখন তিনি, ভাবেন, ভোগাভোগ করেন, কথা ক'ন, ঠিক আর-আর লোকের মতো। আকাশ এবং পৃথিবীকে, সামান্য মর্ত্ত্যেরা যে ভাবে দেখে—তিনিও ঠিক সেই ভাবে দেখেন। তখন, তাঁহার উষ্ণীষ সূর্য্য-অপেক্ষা বড়। তত্ত্বজ্ঞেরও এইরূপ গতি। তিনি সকল সময়ে তত্ত্বজ্ঞ থাকেন না। তাঁহার সামান্য কাজ-কর্ম্মের বেলায় এটা অবশ্য আশা করা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার প্রতিবাসীদেরই ন্যায়—ভাবেন, সুখ দুঃখ ভোগ করেন, কথা বার্ত্তা ক'ন। সম্মুখ-স্থিত বস্তু সকলকে অন্যান্য লোকেরা যে-চক্ষে দেখে, তিনিও তাহাদিগকে সেই চক্ষে দেখিতে পারেন; তাহা যদি না পারেন তবে (একেই তো লোকে বিনা-কারণে দোষ ধরিতে তৎপর) তাহা হইলে তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র লোকে মুখ শিটকাইবে। তিনি যে এইটি জানিতেছেন যে, চিন্তা এবং সত্যের এমন একটা উচ্চ মঞ্চ আছে যেখানে তিনি মনে করিলেই সশিষ্যে আরোহণ করিতে পারেন, ইহাই যথেষ্ট; তা' ভিন্ন, তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার অনুযাত্রীদিগকে সেই উচ্চ-প্রদেশে ক্রমাগতই যে অবস্থান করিতে হইবে—এমন কোন কথা-বার্ত্তা নাই। কবি কি অষ্টপ্রহরই কবি? কখনই না। কবিই তিনি হউন্ আর জ্যোতির্ব্বেত্তাই হউন্—নীচে তাঁহাকে নাবিতেই হইবে, আর, তত্ত্বজ্ঞানীকেও—সেই বৈহায়সী উচ্ছ্রিতি যাহা তাঁহাদের সাধের রাজ্য—সেখান-হইতে নীচে নাবিতে হইবে, আর সেই রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহন করিয়াই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী যখন তত্ত্বজ্ঞানী হ'ন; যখন তিনি

পুরোহিতের পট্টবস্ত্র পরিধান করেন ; যখন নাভসিক অবলোকন-মন্দিরে আরূঢ় হ'ন, এবং কি দেখিলেন তাহা জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করেন ; তখন তাঁহাকে এরূপ করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত—যাহাতে একটা কাজ হয়, তখন আর অপ্রাসঙ্গিক জল্পনা তাঁহার মুখে শোভা পাইতে পারে না। আমরা কি তবে এইরূপ বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, কেবল গ্রহাদিরই প্রকৃত গতিবিধি তাহাদের দৃশ্যমান গতিবিধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; কিন্তু মনুষ্যের চিন্তার ব্যাপার—যাহা গ্রহাদির ব্যাপার হইতে কত-যে মহত্তর তাহা বলা যায় না—তাহার উপর ঐ নিয়মের (কি না প্রকৃত সত্য এবং সত্যাভাস দুয়ের বৈলক্ষণ্য নিয়মের) কোন আধিপত্য নাই—কেবল কি তাহারই বেলায় ঐ নিয়ম-টি খাটে না? ইহাও কি—কথা!

এই তত্ত্বকে স্পর্দ্ধার অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যেরূপ-অন্তঃকরণে সংকল্পিত এবং নিষ্পাদিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কথা কহা বড় যে প্রীতিজনক তাহা নহে, তথাপি এখন তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কেহ বলিতে পারেন, "তোমার আপনার চিন্তার বিষয়ে এবং তোমার আপনার জ্ঞানের বিষয়ে কথা কহাই তোমাকে সাজে, তা' নয় তুমি সকল জ্ঞানের—সকল চিন্তার—নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে যাইতেছ, ইহাতে কি তোমার স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইতেছে না? ইহার প্রত্যুত্তরে ব্যক্তব্য এই যে, যে জ্ঞানই হউক্ না কেন, আর যে চিন্তাই হউক না কেন, কোন-একটি জ্ঞানকে বা কোন-একটি চিন্তাকে জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক নিয়ম-সকলের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া, উহা অপেক্ষা আরো অধিক স্পর্দ্ধার কার্য্য। কারণ, যে-সকল নিয়মের কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে তাহারা অবশ্যম্ভাবী সত্য—তাহাদের প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ত্ত ; এজন্য, কোন জ্ঞান সম্ভবতঃ সে-সকল নিয়মের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারে—এরূপ মনে করাই পাগলামি। আর, বুদ্ধি-ভ্রংশ যে অংশে পাপের লক্ষণ সে অংশে ওরূপ মনে করা পাপের লক্ষণ। জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম হইতে কোন-জ্ঞান কোন-কালে বিচ্যুত হইতে পারে, এ বলা-ও যা, আর, কোন-জ্ঞান অজ্ঞান, কোন-বিজ্ঞতা উন্মত্ততা, কোন-সুবুদ্ধিতা নির্ব্বুদ্ধিতা, কোন-স্থিতি প্রলয়, এ বলা-ও তা, একই কথা। বর্ত্তমান গ্রন্থ এ পাপের দায় এড়াইয়াছে। অতএব যে-সকল ভাক্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা পরম জ্ঞানকে ঐ সকল-নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করে যে, ও-সব-নিয়ম সকল-জ্ঞানের পক্ষে খাটে না—কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের পক্ষেই খাটে—আমাদের সিদ্ধান্ত তাহাদের ন্যায় অতদূর স্পর্দ্ধাক্রান্ত এবং নীতি-বিরুদ্ধ নহে। *

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপুসংযম।

পঞ্চম প্রস্তাব।

মদ।

আমাদিগের একটি স্বাভাবিক আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান আছে। আমরা ঈশ্বরের পুত্র, আমরা

---

* অস্তিত্ব মনুষ্যের একটি চিন্তার সামগ্রী ; এ জন্য যে-সব তার্কিক লোক মানুষিকতাধ্যাস (Anthromorphism অর্থাৎ ঈশ্বরেতে মনুষ্যের ভাব আরোপ করা) এই এক জুজুর ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির, তাঁহারা ঈশ্বরেতে অস্তিত্ব-লক্ষণ আরোপ করিতে অধিকারী নহেন, কেননা অস্তিত্ব মনুষ্যের চিন্তা-গম্য সুতরাং মানুষিক। তাঁহারা যদি একবার এক কথা, আর একবার আর-এক কথা না বলিয়া, তাঁহাদের কথা আগা-গোড়া ঠিক্ রাখিতে চা'ন, তবে নাস্তিক হওয়া-ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতার অধিকারী, আমরা স্বাধীন জীব এবং আমরা অমর, অতএব আমরা মহৎ এইরূপ একটি জ্ঞান ঈশ্বর আমাদিগের আত্মায় গূঢ়রূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব, তাহা যেন অবিকৃত থাকে। তাহা যেন বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বদা সযত্ন থাকিব। কিন্তু মানুষ তাহার এই আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া ফেলে। এই বিকৃতির নাম মদ। এই মদ রিপু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে আমাদের যাহাতে প্রকৃত মহত্ত্ব তাহা যদি আমাদের কিছু মাত্র থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদিগের মনে অধিকমাত্র অহঙ্কার উপস্থিত হয়, আবার যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই তাহা মহৎ মনে করিয়া তাহার জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। মদ রিপুর অধীন হইলে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও পবিত্রতা যতটুকু থাকে ততটুকুর জন্য আমাদিগের মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয় এবং সেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আমরা মনে করি যে আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতায় উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি। আবার যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই, যাহা অস্থায়ী ও অসার, অর্থাৎ ধন সম্পত্তি, খ্যাতি প্রতিপত্তি সাংসারিক সুখ সম্পদ, বংশমর্য্যাদা ও পদগৌরব, এই সকলকে প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ ভাবিয়া আমরা ঐ সকলের জন্য গৌরব বোধ করিতে থাকি। আমাদের আত্মায় ঈশ্বর-নিহিত আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান বিকৃত হইলে এই দশা প্রাপ্ত হয়। আমাদের পবিত্র আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান যাহাতে এরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, এবং এরূপ বিকৃত হইলে যাহাতে আমরা তাহার সে বিকৃতি শীঘ্র দূর করিতে পারি তাহার জন্য আমাদিগের সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য।

আমাদিগের ঈশ্বর-প্রদত্ত আত্মমহত্ত্বজ্ঞান আমাদিগের মঙ্গলেরই কারণ, কিন্তু উহার বিকৃত আকার যে মদ রিপু তাহা আমাদের ঘোর অমঙ্গলের প্রস্রবণ। আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান অবিকৃত ও স্বাভাবিক আকারে রক্ষা করিতে পারিলে কিসে আমাদিগের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা হইবে, কি সে আমরা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় উন্নতি লাভ করিতে পারিব, কিসে আমরা পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব, কিসে আমরা পৃথিবীর স্বাধীনতা-সম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের পদের উপযুক্ত হইব, কি সে আমরা ইহ জীবনের কার্য্য দ্বারা অনন্ত জীবনকে সুখময় শান্তিময় করিতে পারিব, সেই দিকেই আমাদিগের চেষ্টা ও যত্ন স্বভাবতঃ প্রধাবিত হয়, এবং ঐদিকে চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে আমরা ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া সুখ শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে সক্ষম হই। আর যদি আমরা আমাদিগের আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া উহা মদ রিপুতে পরিণত করি তাহা হইলে অল্প জ্ঞান, অল্প ধর্ম্ম ও অল্প পবিত্রতা লাভ করিয়া আমরা মনে করি যে আমরা মহা জ্ঞানী, মহা ধার্ম্মিক, ও মহাপবিত্রতা-সম্পন্ন এবং এইরূপ অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় উৎকর্ষ সাধনে পরাঙ্মুখ হই। আবার যাহাতে মহত্ত্ব নাই গৌরব নাই, মদ রিপুর অধীন হইলে, আমরা সেই সকল পার্থিব অসার ও অস্থায়ী বস্তুতে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে ভাবিয়া তাহারই অনুসরণ করি। এইরূপে ধন, যশ, পদ প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর গৌরব করিতে এবং তাহাদিগকে মহৎ ভাবিতে শিখিয়া আমরা আমাদিগের চিরকালের অমূল্য ধন জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতার

মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে তাহাদিগের গৌরব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। এইরূপ হইলে অজ্ঞান, অধর্ম্ম ও অপবিত্রতার দিকে আমাদিগের গতি হয়—আমরা ক্রমে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকি এবং পাপ-পথে পতিত হইয়া মহা দুর্গতির ভাগী হইয়া হাহাকার করিতে থাকি।

প্রকৃত আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে আমাদিগের আত্মার চক্ষু উন্মীলিত রাখে, মদ রিপু আমাদিগকে ঈশ্বরদর্শন হইতে বঞ্চিত করে। আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগের আত্মার নিত্য আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের গরিমা সর্ব্বদা জাগরূক রাখে, মদ রিপু পার্থিব বস্তুর অস্থায়ী অসার নীচ-কারী গরিমায় আমাদিগের আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে, মদ রিপু আমাদিগকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখিতে চায়। আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে আমাদিগের জীবনের প্রকৃত মহান উদ্দেশ্য সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেয়, মদ রিপু আমাদিগের সে স্মৃতি হরণ করে। আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে সুখ শান্তির পথে রক্ষা করে, মদ রিপু আমাদিগকে দুঃখ, সন্তাপ, ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। অতএব আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া কখন তাহার স্থান মদ রিপুকে অধিকার করিতে দিবেক না, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ, এই উপদেশ।

ব্রাহ্ম যিনি তিনি কখন মদ রিপুর অধীন হয়েন না। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা অনন্তদেব পরমেশ্বরের পুত্র, আমি জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় অনন্ত উন্নতির অধিকারী, আমি স্বাধীন জীব, পশুদিগের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পশু-সংস্কারের অধীন নহি, আমি অমর, অনন্তকাল ঈশ্বরের রাজ্যে থাকিয়া আমি অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকিব, ব্রাহ্ম ইহাই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ জানিয়া শান্তভাবে আত্মায় তাহা পোষণ করিয়া, সেই মহত্ত্ব যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেই মহত্ত্বে যাহাতে কলঙ্ক না পড়ে তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি কখন জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতা লাভ করিয়া তাহার জন্য অহঙ্কার করেন না, কেন না তিনি জানেন যে জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় তিনি যত দূর উন্নতি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাদের পক্ষে আরও উন্নতি সম্ভব, এবং পূর্ণ জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতার নিকট তাহা অতি সামান্য, আর ঈশ্বরের এই বিশাল জগতে তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতা সম্পন্ন জীব কত রহিয়াছে। তিনি ধনের গৌরব করেন না, যশের গৌরব করেন না, পদ-মর্য্যাদার গৌরব করেন না, উচ্চ বংশের গৌরব করেন না। এই সকলের যে সারবত্তা নাই, স্থায়ী কোন মূল্য নাই, প্রকৃত কোন মহত্ত্ব নাই, তাহা তিনি সম্যক্ বুঝেন। বিপুল-ধন-সম্পন্ন হইলেও, অশেষ মানী হইলেও, কিম্বা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইলেও তিনি দরিদ্রের ন্যায়, যশহীনের ন্যায় ও উচ্চ-পদ-শূন্য ব্যক্তির ন্যায় নম্র ও বিনীত হয়েন। তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও পবিত্রতাতেই মানুষের মহত্ত্ব জানিয়া তাহাই অর্জ্জন করিতে করিতে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে মদ রিপুকে এইরূপে পরাজিত করিতে না পারেন, তাঁহার আত্মার উপর মদ রিপুর প্রভাব এইরূপে বিনষ্ট করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন। তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স।

কি সে স্বাস্থ্য থাকে এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় কঠিন। অনেকেই বলেন মিতাহার মিতাচার ও ব্যায়ামাদি নিয়ত অভ্যাস কর এবং আর আর নিয়ম পালন করিয়া চল স্বাস্থ্য থাকিবে। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায় যে মনুষ্যের পক্ষে সকল কাল ও সকল অবস্থায় ইহাতেও বিশেষ কাজ হয় না। এই সকল উপায়ে হয় তো কেহ ভাল থাকেন আবার কেহ বা তাদৃশ সুফল পান না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে এদেশে এক সময় এই স্বাস্থ্যের প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং আয়ুর্ব্বেদই ইহার মীমাংসা করিয়া যান। এই আয়ুর্ব্বেদের এক ঋষি কহিয়াছেন, স্বাস্থ্য কিসে থাকে ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, অগ্রে স্বাস্থ্যের মূল স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক বয়স অবধারণ আবশ্যক। কারণ স্ত্রীপুরুষের যাদৃশ আচার আহার ও চেষ্টা তাহাদের পুত্রও তদনুরূপ হইয়া থাকে (১)। এই সূত্রটুকু ধরিয়া স্বাস্থ্যের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈবাহিক বয়স নির্ণয় করা চাই। কারণ চেষ্টার সহিত বয়সেরই গুরুতর ও ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষি এই বৈবাহিক বয়স নির্দ্ধারণে কেবলই যে মনুষ্যের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইহার সহিত জনসমাজের অবস্থা অর্থাৎ দেশকাল পাত্র যথাযথ বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং আয়ুর্বেদের ব্যবস্থা অতি গভীর ও ব্যাপক। আমরা ইহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এখনকার সমাজসংস্কারকেরা বিবাহের এই বয়স সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অগ্রে তাহার আলোচনা করিব।

এখনকার কৃতবিদ্যদিগের মতে পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল। অবশ্য স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে ইহা প্রতিকূল কাল নহে কিন্তু এতদ্দেশের যেরূপ পারিবারিক প্রথা স্ত্রীর এই বৈবাহিক বয়স তাহার খানিকটা প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এখনও একান্নবর্ত্তি সংসার আছে। ইহা যে শীঘ্র নির্ম্মূল হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প। ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহার মূল শিথিল করিতেছে কিন্তু বর্ত্তমান ধরিয়া সকল স্থলে ভবিষ্যৎ মীমাংসা হইতে পারে না। এস্থলে তুলনা দ্বারা পরীক্ষা কর তাহা হইলে ইওরোপের সহিত আমাদের পারিবারিক অবস্থাগত কত প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। তথাকার পারিবারিক ভিত্তি আর্থিক কিন্তু এখানকার নৈতিক। তথায় স্বার্থ পিতাপুত্রের মধ্যেও বিচ্ছেদ আনিয়াছে। কিন্তু এখানে নিঃস্বার্থ, ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবোধ উভয়কে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এইরূপে বুঝিলে আমাদের পারিবারিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় বোধ হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি রাজনৈতিক শক্তি ইহার অনুকূল নয়। যদিও ইচ্ছা না থাকে তথাচ আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান পারিবারিক বন্ধন বাধ্য হইয়া ছেদন করা সম্ভব। অবশ্য, আপাত দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইতে পারে কিন্তু তাহাও ঠিক্ হইতেছে না। কারণ জগতের নিয়ম এই যাহা সৎ বা মঙ্গল তাহা এককালে যায় না। যদিও কোন বাহ্য কারণে আপাতত যায় কিন্তু তাহার পুনরাবৃত্তির খুব সম্ভাবনা থাকে। বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করেন আমাদের বর্ত্তমান পারিবারিক প্রথা যদিও কোন কোন অংশে দোষস্পৃষ্ট কিন্তু ইহাতে গুণের ভাগ অধিক আছে। কিন্তু সে কথাও ছাড়িয়া দেও। হিন্দুর মর্ম্মগত বিশ্বাস এই যে পোষ্যবর্গকে অন্ন-বস্ত্র-দান একটী নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য্য। আমি অন্ন পাইব আমার বৃদ্ধ

(১) আচারাহারচেষ্টাভিঃ যাদৃশাভিঃ * * * *
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ।

পিতামাতা বা অক্ষম ভ্রাতা অন্ন পাইবে না এ দৃশ্য বা চিন্তা হিন্দুর প্রাণে সহনীয় হয় না। যদি কেবল এইটুকু ধরিয়া বিচার করি তাহা হইলে কি সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এই ধর্ম্মবিশ্বাসের বলেই শত শত রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? এ বিষয়ে আরও একটু গূঢ় কথা আছে। ইওরোপের অন্নকষ্ট প্রতিযোগিতা নিবন্ধন। যাহার ক্ষমতা অধিক লক্ষ্মী তাহারই। কিন্তু এদেশে ঠিক্ এরূপ নয়। ইহা এখন অস্বাধীন। বিশেষত শাসন ও বানিজ্য একের হস্তে। দেশের অর্থ ও শস্য আর দেশে থাকে না। এই জন্যই কষ্ট সর্ব্বব্যাপী হইতেছে। ভ্রাতা অক্ষম সুতরাং সে অন্ন পায় না দেশব্যাপক কষ্টের সময় এ বিচার থাকে না। প্রত্যুত এই অধীনতার হস্তে যতই কষ্ট বাড়িবে ততই স্বার্থপরতা প্রবল না হইয়া মনুষ্য-প্রকৃতির নিয়মে দয়াই বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া দিনান্তে শাকান্নে জঠরজ্বালা নিবারণ করিব এই ভাব প্রবল হওয়াই খুব সম্ভব। কারণ ইহা ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষ। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে এ দেশের এই পারিবারিক বন্ধনের মূল যদিও কিছু শিথিল হইতেছে কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে ভবিষ্যতে ইহা এককালে নির্ম্মূল হইবে।

এখন বক্তব্য এই, যে, এই একান্নবর্ত্তিতা ভবিষ্যতে টেঁকুক বা নাই টেঁকুক সে বিষয়ের সবিস্তর মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইহা ঠিক্ যে ইহা এখনও আছে, এবং শীঘ্রই যে যাইবে তাহাই বা কে বলিল। এখন আইস প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল স্থির করিলে এই একান্নবর্ত্তিতার সহিত তাহার প্রতিকূলতা দাঁড়ায়। কারণ এই একান্নবর্ত্তিতার মূল ধর্ম্ম। একটী একান্নবর্ত্তি পরিবারে নানা প্রকৃতির লোক থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত না করে তাহা হইলে পারিবারিক স্থিতিভঙ্গ অপরিহার্য্য। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়সটী কি বস্তু তাহা ও একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ। এই সময়ে প্রকৃতির নিয়মে স্ত্রীর প্রবৃত্তি সকল যার পর নাই উদ্দাম হইয়া উঠে। কল্পনার অলৌকিক চক্ষে নয় যদি সরল ভাবে বুঝ, নিয়ত যাহা ঘটিতেছে যদি তাই ধরিয়া বুঝ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ধর্ম্ম ও সৎসঙ্গের বূহমধ্যে থাকিলেও শতের মধ্যে অন্তত উননব্বইটীকে প্রকৃতি এই বয়সে ভোগপ্রবণ করিয়া ফেলে। সুতরাং ইহা স্থির কথা যে এই বয়স স্ত্রীলোকের ভোগবুদ্ধি বাড়াইয়া তুলে। এই ভোগের সহিত স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এদিকে আমাদের সাধারণত যেরূপ অবস্থা তাহাতে পাঁচটার মধ্যে এক জনের সর্ব্বাঙ্গীণ ভোগ চরিতার্থ হওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং এই ভোগবুদ্ধিই ক্রমশ ঐ স্ত্রীকে স্বার্থপ্রবণ করিয়া ফেলে। আবার যখন স্বার্থ প্রবল হইতে থাকে তখন ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবোধ আর বড় একটা স্থান পায় না। এখনও সামান্য গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ যে পৃথক-অন্ন হইয়া পড়ে তাহার মূল অনেক স্থলেই এই স্ত্রীলোকের ভোগপ্রবৃত্তি বা স্বার্থ। সুতরাং বর্ত্তমান সংস্কারকেরা পঞ্চদশবর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করিয়া সমাজমধ্যে এই মহৎ দোষটী আরও ডাকিয়া আনিতেছেন। এই ভোগলুব্ধ স্ত্রী আসিয়া কেবল আপনার ভোগ ও ভর্ত্তাকে বুঝিতে থাকিবে। স্বার্থের উৎপীড়নে ইহার নিকট অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিবার প্রায়ই উপেক্ষিত হইবে এবং অনেক নিরুপায় লোক যার পর নাই অন্নাভাবে কষ্টে দিন-

পাত করিবে। সুতরাং এখনও যখন এদেশে একান্নবর্ত্তি সংসার আছে এবং শীঘ্রই যে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহারও যখন স্থিরতা নাই তখন স্ত্রীলোকের এই ভোগপ্রবণ পঞ্চদশ বর্ষকে বিবাহকাল স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে এই ভারতে একজন আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষির এই পূর্ব্বোক্ত চিন্তা উদয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের অপেক্ষা তিনিই ইহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া যান।

অয়ুর্ব্বেদে আছে পিতা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও সন্ততির জন্য পঞ্চবিংশতি বৎসরের পাত্রকে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা দান করিবে। আমরা স্বাস্থ্যের মূল প্রশ্ন উপলক্ষে বিবাহের বয়স অবধারণের কথা তুলিয়াছি। সুতরাং অনেকে এই বৈদিক সিদ্ধান্ত বাল্যবিবাহ-দোষে উপহত বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু বৈদিক ঋষি এই-টুকু মাত্র বলিয়া বিরত হন নাই। তিনি পরে বলিতেছেন এই পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় পুরুষ এই অপ্রাপ্ত-ষোড়শবর্ষা স্ত্রীতে যদি গর্ব্ভাধান করে তাহা হইলে গর্ব্ভস্থ জীব নষ্ট হয়। আর যদিও জন্মায় তাহা হইলে চিরজীবি হয় না। অথবা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ হীনবীর্য্য হইয়া জীবিত থাকে। অতএব ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কাতে গর্ব্ভাধান অকর্ত্তব্য (২)। এস্থলে আমরা দুইটী বিভিন্ন বিষয় পাইতেছি। প্রথম দ্বাদশে বিবাহ, দ্বিতীয় ষোড়শে গর্ব্ভাধান। এ-স্থলেও তুমি বলিতে পার তবে ষোড়শ-বর্ষ বিবাহকাল না হয় কেন। কিন্তু পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে এদেশের পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি নৈতিক। যে কারণ দর্শাইয়া বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের মত দূষিত বলিলাম এই ষোড়শেও সেই দোষ। এই জন্য বৈদিক ঋষি দ্বাদশবর্ষকে স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সহিত ধর্ম্ম অর্থ ও কামের যোজনা করিয়াছেন। এখন তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইবে। আমাদের পারি-বারিক বন্ধন সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বার্থান্ধ ষোড়শীর মনে এই কর্ত্তব্য-বীজ অঙ্কুরিত করা কষ্ট-সাধ্য। সে কেবল আত্মসুখ-বুদ্ধিতে পরগৃহে আসি-য়াছে। বলিতে কি, বয়সই তাহার এই ইচ্ছার স্রষ্টা। পরিবারের মধ্যে যাহারা তাহার আত্মসুখের প্রতিবন্ধক ক্রমশ তাহারাই উহার পর হইয়া থাকে। সে কেবলই ইচ্ছা করে সকলের সহিত পৃথক্ হই। কিন্তু স্ত্রীলোকের দ্বাদশবর্ষ ষোড়শের ন্যায় ভোগপ্রবণ নয়। সে সেই বয়সে পরগৃহে আসিয়া গুরুজনের নিকট সহজে কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে পারে এবং করেও। তাহার মনের ভাব কোনও অংশে ইহার প্রতিকূল নয়। আবার ষোড়শ বর্ষে নিজের বুদ্ধিই অনেক সময় পর্য্যাপ্ত কিন্তু দ্বাদশে তাহা প্রায়ই হয় না। এই জন্য হিন্দুপরি-বারের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এই বয়সেই ফল-বৎ হওয়া সম্ভব এবং পরিবারস্থ লোকের গুণে তাহা হইয়াও থাকে। একটী লতা পরিণত না হইতে তাহাকে যথেচ্ছ নোঙাইতে পারা যায় কিন্তু পাকিলে আর সহজে তাহা হয় না। যাহাই হউক এইরূপে ভর্ত্তৃগৃহে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম শিক্ষার নিমিত্ত দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অতীত হইয়া যায়। পরে তা-হার স্বামিসন্দর্শন। এখনও যে এই বেদোক্ত উপদেশ হিন্দু পরিবারে যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে তাহা নহে। কিন্তু ইহার অনুরূপ

(২) পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীং আবহেত
পিত্রা ধর্ম্মার্থকাম প্রজা প্রাপ্তৌ।
ঊনষোড়শবর্ষায়াং সংপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে,
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেৎ বা দুর্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাৎ অত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।

অনেকটা আজও আছে। আজও এমন শত শত পরিবার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াও প্রকারান্তরে এই বেদোক্ত নিয়ম পালন করিতেছে। এদেশের অনেক লোক কন্যার বিবাহের পর স্বামিসমাগম না হইবার জন্য যুগ্ম বৎসর দ্বিরাগমন প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া থাকে। এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে গিয়া কন্যার পুনঃসংস্কারের কাল উপস্থিত হয়। পরে তাহার স্বামিসমাগম ঘটিয়া থাকে। এ দিকে আবার শারীরতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন যে যদি দূষিত পারিবারিক বায়ু কন্যার মন মলিন না করে তবে তাহার পুনঃসংস্কারের কাল সচরাচর চৌদ্দ বা পনর। কিন্তু স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে বৈদিক ঋষি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ষোড়শবর্ষকে স্বামিসমাগমের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং যখন এদেশে একান্নবর্ত্তিতার প্রথা আজিও ভাঙ্গে নাই তখন পঞ্চদশবর্ষ না হইয়া এই দ্বাদশবর্ষই বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

এখন তুমি এই কথা তুলিতে পার যে একান্নবর্ত্তি সংসারের উপযোগী শিক্ষার বিষয় তুমি যাহা বলিলে তাহা কি স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে হইতে পারে না? তজ্জন্য তাহার দ্বাদশে বিবাহ দিবার বিশেষ আবশ্যকতা কি। অবশ্য আমরাও স্বীকার করি শিক্ষার স্থূল স্থূল কতকগুলি পিতৃগৃহে না হইতে পারে এমন নয়। কিন্তু ইহার ভিতর একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। প্রত্যেক পরিবারে কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ ভাব থাকে। সুতরাং সেই বিশেষত্বটুকু শিক্ষা করা ক্ষেত্র না পাইলে সম্ভবপর হয় না। এমন কি সেই বিশেষত্বের জন্য পারিবারিক মানমর্য্যাদা সমস্তই নির্ভর করে। এই জন্য পিতৃগৃহের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা বলা যায় না। আর একটী কথা এই যে মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা কার্য্যত শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আছে। পিতৃগৃহে মাতা বলিলেন শ্বশুরকে ভক্তি করিও, দেবরকে স্নেহ করিও, যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিও। কিন্তু ভর্ত্তৃগৃহে শ্বশ্রূ কহিলেন যাও ঐ তোমার শ্বশুর, উহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর, এই তোমার স্নেহের পুত্তলী দেবর, ইহাকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিলাম পালন কর। মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা এই রূপ কার্য্যত শিক্ষার বল কি অধিক নয়? এই সমস্ত ভক্তি ও স্নেহের পাত্রদিগের গাঢ় সংশ্রব নিবন্ধন ভক্তি স্নেহ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি কি অপেক্ষাকৃত সতেজ হয় না? ফলত বাল্যে ভর্ত্তৃগৃহে কার্য্যত এই সমস্ত সৎবৃত্তির নির্বিঘ্নে অনুশীলন হইবে বলিয়া বৈদিক ঋষি স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ বিবাহকাল স্থির করিয়াছেন। আর স্বার্থপ্রবণ ভোগলোলুপ ষোড়শে ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য এই জন্য ষোড়শকে পরিহার করিয়াছেন।

এখন তোমার এই এক আপত্তি হইতে পারে যে দ্বাদশ বর্ষ কন্যার বিবাহকাল স্থির হইলে সেই বালিকা স্বয়ং পাত্র-নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না। কন্যার স্বয়ং পাত্রনির্ব্বাচন করা উচিত কি না সে বিচার এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে হইতে পারে না। তবে তোমাদের নির্ব্বাচনের অর্থ এই যে যাহার সহিত চির জীবন থাকিতে হইবে তাহার দোষ-গুণ-বিচার। তোমার মতে তাহা দ্বাদশে কোনও মতে সম্ভবে না। কিন্তু এস্থলে আমরাও তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চদশেই কি তাহা হয়—না রূপজ মোহ আসিয়া সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দেয়? স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ এই দোষ-গুণ-বিচার পঞ্চদশেও সম্ভব নয়। আর তোমার আর

এক আপত্তি এই দ্বাদশে স্ত্রীর ভর্ত্তৃত্ব জ্ঞান জন্মে না? প্রত্যুত্তরে আমিও বলিব দায়িত্ব বোধের সহিত ভর্ত্তৃত্ব জ্ঞান পনর বৎসরেও হয় কি? সুতরাং এ বিষয়ের একটা স্থূল জ্ঞান পনর ও বার উভয়ত্রই সমান। এই জন্য বলিতেছি দ্বাদশ বর্ষ যখন এদেশের পারিবারিক প্রকৃতির উপযোগী তখন স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ এবং পুরুষের পক্ষে পঁচিশ বিবাহকাল হওয়া উচিত। তবে সৎপাত্রের অভাবে এই কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহাতে তোমার দোষ কি। এই বিষয়ে পূর্ব্বতন কোনও সংস্কারক বলিয়াছেন সৎপাত্রের অলাভে কন্যার চিরকৌমার্য্যও দূষণীয় হইতে পারে না। ফলত হিন্দুর গৃহে আজিও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

যাক্, বৈদিক ঋষি স্বাস্থ্যের জন্য বিবাহের বয়ঃপ্রশ্ন মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেই সুদূর অতীতে এই নির্দ্দিষ্ট বিবাহ বয়সটী সমর্থন করিবার জন্য একটী বৈজ্ঞানিক তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছেন গর্ভস্থ সন্তানের কেশ শ্মশ্রু নখ লোম অস্থি ও স্নায়ু প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সকল পিতৃজ (৩)। আর মাংস শোণিত মেদ মজ্জা ও হৃৎ প্রভৃতি কোমল পদার্থ সকল মাতৃজ (৪)। তিনি বলিয়াছেন সন্তানের অবয়বগত এই পিতৃজ ও মাতৃজ অংশগুলি গর্ভে নির্দ্দোষ ভাবে জাত হইলে তবে সে সুস্থ হইবে। এইটী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ, কিন্তু আমাদের নিকট ইহা বিজ্ঞান অপেক্ষা সমধিক কবিত্ব-ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক তিনি যে স্ত্রী পুরুষের বিবাহোপযোগী বয়োনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ দেশকাল ও পাত্রসঙ্গত ইহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের মীমাংসায় তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরও একটু দোষ আছে। বর্ত্তমান সংস্কারকেরা বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া সমাজের ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কিন্তু সমাজের পক্ষে ধর্ম্মনীতিও একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। আমরা এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাই না, সংস্কারকেরা অপক্ষপাতে বুঝিয়া দেখুন অতিপ্রমাণ স্বাধীনতার সহিত এই বয়স্থা অনূঢ়ার পরিচয় থাকিলে একটা বিপদের সম্ভাবনা থাকে কি না। আমাদের মধ্যে সদ্বিদ্বান বিচক্ষণ লোকেরা যে সমস্ত পত্রদ্বারা জনসমাজে নবজীবন প্রচার করিতেছেন তন্মধ্যে এতৎসংক্রান্ত লোমহর্ষণ ঘটনা পাঠ করা যায়। এই সমস্ত কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক অবশ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যায় যে বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অতিপ্রমাণ স্বাধীনতার সহিত এই বয়স্থা অনূঢ়ার পরিচয় হইলে দোষ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক স্থলে ঘটিয়াও থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের মীমাংসায় দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা দোষ পরিহার করিতে গিয়া আর একটা গুরুতর দোষের প্রশ্রয় দান। এই জন্য বলি সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কেবল বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। ধর্ম্মনীতি সুরক্ষিত হইবে কি না তাহাও দেখা চাই। জনসমাজ হইতে যদি ধর্ম্মনীতি যায় তবে তাহার থাকে কি? কিন্তু হিন্দু ঋষির মীমাংসায় এ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব অল্প। ইহা নিশ্চয় কথা স্ত্রীলোক পিতৃগৃহ অপেক্ষা ভর্ত্তৃগৃহে নৈতিক শাসন

(৩) গর্ভস্য কেশশ্মশ্রু লোমাস্থি নখ দন্ত শিরা স্নায়ু ধমনীরেতঃ প্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি।

(৪) মাংস শোণিত মেদো মজ্জাহৃৎনাভি যকৃৎ প্লীহান্ত্রগুদ প্রভৃতানি মৃদূনি মাতৃজানি।

রক্ষার জন্য একটু বিশেষ মনোযোগী হয়। কারণ ভর্ত্তৃগৃহ তাহার সাংসারিক জীবনের মুখ্য ক্ষেত্র। তথায় জয়লাভ করিতে পারিলে তাহার তিন কুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে হিন্দুস্ত্রীর ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। অতএব তুমি যদি দ্বাদশে কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার সমস্ত সৎবৃত্তির অনুশীলন করিবার জন্য ভর্ত্তৃগৃহে রাখ তাহা হইলে আত্মরক্ষা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। এখনও দেখ হিন্দুর ভিতর বিবাহের পর কন্যাকে যে পিতৃগৃহে বড় থাকিতে দেয় না ইহার কারণই এই। যাহাই হউক, বর্ত্তমান সংস্কারকেরা বিবাহের বয়োনির্দ্ধারণে যখন ধর্ম্মনীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন তখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে কোনও জনসমাজের উপযোগী নয় তাহা সুনিশ্চিত। সূক্ষ্ম বুঝিতে গেলে ইহা সমাজগঠনের জন্য নয় ইহা সমাজভঙ্গের জন্য। ঐ নিয়ম যত শীঘ্র এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় ততই এদেশের মঙ্গল।

আমরা উপসংহারে সংস্কারকদিগকে একটী কথা বলি। হিন্দু সমাজের ভিত্তি নৈতিক। ইহা বড় উন্নত সমাজ। ইহার ভিতর কোন রূপ সংস্কার আনিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইওরোপের সামাজিক ভিত্তি আর্থিক। তাহার দৃষ্টান্তে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন আনিলে ইহার বক্ষে তাহা কখন সহ্য হইবে না। কিন্তু সমাজ এক স্থলে কোন কালেই দাঁড়িয়া থাকিবার নয়। তুমি ইচ্ছা না করিলেও ইহা আপনার শক্তিতে চলিতে থাকে। কিন্তু তা বলিয়া শঙ্খাসুরের ন্যায় বেগবতী ভাগীরথীর স্রোতকে অন্য দিকে লইয়া যাইও না। ইহা আপনার শক্তিতে চলুক। আম্র বৃক্ষে কখন নিম্ব ফলিবে না। তবে তোমার কার্য্য কেবল তাহার কণ্টক শোধন করা। তুমি দেশকাল বুঝিয়া তাহাই কর। দেখিবে এই হিন্দু সমাজের বক্ষে সেই অতীতের গভীরে প্রোথিত নৈতিক বীজ যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য কখন কুফল প্রসব করিবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর। প্রথমভাগ।

২। উদ্গীথা—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

৩। পুত্রপ্রসবিনী—পুত্র। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত।

৪। মদ খাও নেশা ছুটিবে না। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই গ্রন্থ লেখক মহাকবি হাফেজের ন্যায় এক অলৌকিক মদের আমদানি করিয়াছেন। ইহার গুণ এই যে অন্য মদের ন্যায় ইহার নেশা ছুটিবে না। আমরা সকলকেই এই মদ পান করিতে অনুরোধ করি।

৫। Revised Prayer book. Compiled by the Rev. Charles Voysey. B A.

৬। Voysey's Sermons—1885.

৭। Theistic Church—The order of public worship &c—

Bibliotheca Indica. Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. N. 575. (Lalita-Vistara)
N. S. N. 576. (Zafarnamah)
N. S. N. 577. (Prithiraja Rasau)
N. S. N. 578. (Uvasagadasao)
N. S. N. 579. (Chaturvarga chintamani)
N. S. N. 580. (Nirnkta)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal May, June 1886.

Theosophist, August 1886.

Fellow Worker, July 1886.

ধর্ম্মপ্রচার। আষাঢ় ১২৯৩।

বামাবোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১২৯৩।

আলোচনা। ঐ

নব্য ভারত। ঐ

প্রচার। ঐ

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার "বালী ধর্ম্ম সমাজের" চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ভাদ্র রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। পরমাত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। প্রথমে পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। জ্ঞানের বিষয় যখন জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত, তখন তাহার প্রতি চক্ষু উন্মীলন করা'র নাম দর্শন। পরমাত্মা যখন আমাদের জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত, তখন তাঁহার প্রতি জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই পরমাত্মাকে দর্শন করা হয়। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে সর্ব্বদাই উপস্থিত; কিন্তু মোহ-অন্ধকার মাঝখানে আসিয়া যখন তাঁহাকে আড়াল করিয়া ফেলে তখন পরমাত্মা আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিত; আবার যখন শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের আলোক আসিয়া মোহ-অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়, তখন পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হন, তখন মনঃসমাধান করিলেই আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হই।

আমাদের জ্ঞান নানা জাতীয়; সকল জাতীয় জ্ঞানকে আমরা দর্শন বলি না; যে জ্ঞানের লক্ষ্য-বিষয় আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত, সেই জ্ঞানকেই আমরা দর্শন বলি। স্মরণ-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ, অনুপস্থিত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে। ভাবনা-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুপস্থিত বিষয়কে উপস্থিতের মত করিয়া মনোমধ্যে কল্পনা করা'র নামই ভাবনা; দৃষ্ট বিষয় ভাবনার বিষয় নহে, অদৃষ্ট বিষয়ই ভাবনার বিষয়। অনুমান-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুমান ভাবনারই দল-ভুক্ত; দৃষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধ-সূত্রে অদৃষ্ট বিষয়ের ভাবনা, যেমন ধূমের সম্বন্ধ-সূত্রে অগ্নির ভাবনা, ইহারই নাম অনুমান। অনুমান ভাবনা-বিশেষ সুতরাং তাহা দর্শন নহে।

দর্শন তবে কি? চক্ষের দর্শনকেই সচরাচর আমরা দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু চক্ষের দেখাই শুধু যে, দেখা, তাহা নহে; তদ্ব্যতীত মনের দেখা আছে, আত্মার দেখা আছে। মনের দেখা এবং

আত্মার দেখা এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদও আছে। মনের দেখা এক প্রকার স্বপ্ন দেখা, তাহা অতীব চঞ্চল; স্বপ্নে কল্য যাহা দেখিয়াছি অদ্য তাহা দেখিতে পাই না; কল্য আমার মনোমধ্যে কত কি উদয়াস্ত হইয়াছে, অদ্য তাহা আমার মনে নাই। মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষের দেখা স্থিরতর; কল্য যে-সব চিন্তা যেরূপ পূর্ব্বাপরক্রমে আমার মনোমধ্যে দেখা দিয়াছে, অদ্য সেরূপ পূর্ব্বাপর-ক্রমে সে-সব চিন্তার দেখা পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে এই সমাজ-মন্দিরের যেখানে যে প্রাচীর দেখিয়াছি, আজিও ঠিক্ সেইখানে সেই প্রাচীর দেখিতেছি; অতএব চক্ষের দেখা মনের দেখা অপেক্ষা স্থিরতর। আত্মার দেখা চক্ষের দেখা অপেক্ষাও স্থিরতর। এমন কত বিষয় আমরা চক্ষে দেখিয়াছি—এখন যাহা কেবল মনশ্চক্ষেই কথঞ্চিৎ দেখিতে পাই, এক সময়ে যাঁহাকে আমরা প্রতিনিয়তই ঘরে দেখিয়াছি—এখন হয় তো সাতসমুদ্র-পারে না গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আত্মাকে দেখিবার জন্য কোন কালেই দূরে যাইতে হয় না। বিষয়-দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে, এই জন্যই তাহা অনিশ্চিত; আত্মার দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন, এই জন্যই তাহা স্থিরতর। আমাদের চক্ষুর দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে, আলোকের দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে, মালিন্য প্রভৃতি বিষয়ের নিজ দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে; আবার মন এবং চক্ষু এ দুয়ের সহিত যোগচ্যুত হইলেও বিষয় অদর্শন হয়। এক স্থানে আমাদের চক্ষু, আর এক স্থানে সূর্য্য চন্দ্র বা প্রদীপ, আর এক স্থানে বিষয়; কাজেই, বিষয়-দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু আত্মার বিষয়, আত্মার আলোক, এবং আত্মার চক্ষু সমস্তই একাধারে বর্ত্তমান, এজন্য আত্ম-দর্শন আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন। অতএব মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষের দেখা স্থিরতর, চক্ষের দেখা অপেক্ষা আত্মার দেখা আরো স্থিরতর। মনের দেখা অপেক্ষা, চক্ষের দেখার সহিত আত্ম-দর্শনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চক্ষের দেখা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—সম্মুখ-স্থিত প্রাচীরকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; আত্মার দেখা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান,—আত্মাকে আমরা স্বতঃ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মারই দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, উভয়ের কোনটিরই বিষয় অনুপস্থিত নহে, উভয়েরই বিষয় উভয়ের সন্নিধানে উপস্থিত; দৃষ্ট বস্তু চক্ষুর সন্নিধানে উপস্থিত, আত্মা আত্মার সন্নিধানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান শাস্ত্রাদিতে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা দর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি প্রভেদও আছে; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সময়ে উপস্থিত হয় এবং সময়ে অনুপস্থিত হয়,—এই সমাজ-মন্দির এখন আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই অনুপস্থিত হইবে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় চিরকালই আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত থাকিবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও—উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান অনেক স্থানে দর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অতএব পরমাত্মাকে দর্শন করিবে ইহার অর্থ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে—আত্ম-প্রত্যয়ে—দর্শন করিবে। মনকে নির্ম্মল করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা যেমন আমাদের আত্মাকে দেখিতেছি—তেমনি আমাদের আত্মার অশেষ প্রকার অভাবও দেখিতেছি; আমাদের মন কখনো বিষাদে আচ্ছন্ন, কখনো দুঃখে ম্রিয়মান, কখনো আনন্দে উৎফুল্ল; আমাদের আত্মা এইরূপ সুখ-দুঃখ-ময় মানস-চক্রে নিয়ত বিভ্রান্ত হইতেছে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা আমাদের আত্মার অপূর্ণতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি এবং সেই অপূর্ণতার পূরণস্বরূপে পরিপূর্ণ মহান্ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; এইরূপে তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত প্রণাম করি—তাঁহাতে আমরা হৃদয় সমর্পন করি, তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভাব—সমস্ত বেদনা—উন্মুক্ত করিয়া দিই। তখন তিনি আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন—শান্তি-বারিতে তিনি আমাদের আত্মাকে পরিপ্লুত করেন—অমৃতের উৎস উৎসারিত করিয়া দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলিতেছেন

"সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

"জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান বৃক্ষে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদা শোক করিতে থাকে, কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না॥" জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছে ইহার অর্থ কি? এক স্থান-স্থিত দুই বস্তুর একটিকে ছাড়িয়া যেমন আর একটিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, বৃক্ষকে ছাড়িয়া বৃক্ষ-নিঃসৃত শাখা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, কেননা জীবাত্মার যাহা কিছু সমুদায়ই পরামাত্মাকে এবং তাঁহার প্রসাদকে অপেক্ষা করে। চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য, কবির কবিতা-মাধুর্য্য, এবং গায়কের গীত-মাধুর্য্য যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্যের অনুপ্রকাশ, জীবাত্মার জ্ঞান-প্রেম সেইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেমেরই অনুপ্রকাশ। স্বভাবের সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া যেমন চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মা কিছুই নহে। স্বভাবের সৌন্দর্য্য যদি কোথাও না থাকে, তবে চিত্রকরের চিত্র কবির কবিতা, এবং গায়কের গীত, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়; আর, স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত উহারা যত ঘনিষ্ঠ-রূপে সংযুক্ত থাকে, ততই উহারা সজীবতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত যত প্রগাঢ় রূপে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা ততই সজীবতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের জ্ঞান যে-অংশে সজীব জ্ঞান, আমাদের প্রেম যে-অংশে সজীব প্রেম, আমাদের আত্মা যে-অংশে সজীব আত্মা, সেই অংশে তাহা পরমাত্মার অনুপ্রকাশ। এইরূপে আমরা পরমাত্মাকে জ্ঞানালোকের সূর্য্য রূপে, আত্মার অভাবের পরিসমাপ্তি রূপে, আত্মার ধ্রুব এবং অপরিবর্ত্তনীয় আশ্রয় রূপে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি।

সুন্দর বস্তু দেখিবা মাত্র আমরা যেমন তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হই, পরমাত্মার দর্শন-মাত্রে আমরা তাঁহার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হই; তখন আমাদের কঠিন মন প্রেমে গলিয়া কোমল হইয়া যায়, তখন আমরা তাঁহাকে আত্মাতে চিরকাল প্রেম-বন্ধনে

বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পর-মাত্মাকে চির-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে—তেমন প্রেম কোথায়? পর-মাত্মা নিজে যেমন অসীম প্রেমের আকর তেমন আর কে? তাঁহার প্রেমের কোটি অংশের একাংশ পাইলে আমরা দেবতাদি-গের অপেক্ষাও ধন্য হইয়া যাই! পরমাত্মা যখন তাঁহার অতুলন মহিমা এবং মধুময় সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের আত্মাতে আবি-র্ভূত হ'ন, তখন আমরা তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করি, তাঁহাতে হৃদয় সমর্পণ করি, তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বারিতে দেহ মন পবিত্র করি, তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা এক-কালে কত আনন্দ ধারণ করিতে পারে? উষার পবিত্র নিশ্বাসে পূর্ব্বদিক্ আরক্তিম হইয়া উঠে এবং সেই নিশ্বাসেই উষা অন্ত-র্হিত হইয়া যায়! পরমাত্মা আমাদিগকে দর্শন দিয়া আমাদের আত্মাকে যত দূর পূর্ণ করিবার হয় তাহাকে পূর্ণ করেন, যে আত্মার যত দূর ধারণ-শক্তি তাহাকে তত দূর কৃতার্থ করেন, অবশেষে আমাদের দর্শন হইতে অ-ন্তর্হিত হ'ন;—তখন আমরা কোথায় ছিলাম, আর কোথায় আসিয়া পড়ি! সূর্য্যের অদ-র্শনে পৃথিবীর যেরূপ দশা হয়, পরমাত্মার অদর্শনে আত্মার সেইরূপ দশা হয়। পর-মাত্মা যখন অদর্শন হ'ন, তখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমরা কি নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন "পরমা-ত্মাকে দর্শন করিবে।" কিন্তু যখন তিনি আমাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হ'ন, তখন আমরা কি করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন শ্রবণ এবং মনন করিবে। শ্রবণ-দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হয় এবং পুনর্দর্শনের স্পৃহা উ-দ্দীপ্ত হয়। দর্শন-দান করা পরমাত্মার কার্য্য—কিন্তু দর্শন-স্পৃহাকে অবসন্ন হইতে না দেওয়া আমাদের কার্য্য; অগ্নি-উপাস-কেরা যেমন ইন্ধন-সংযোগ করিয়া সর্ব্বদাই অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখে, সেইরূপ ঈশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ দ্বারা ঈশ্বর-স্পৃহাকে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। তাহার পর শ্রুত বিষয়ের মনন করা কর্ত্তব্য। অনুপস্থিত বিষ-য়কে ভাবনাতে উপস্থিত করিবার নাম মনন। পরমাত্মা যখন আমাদের অন্তশ্চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার কথা-শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার দর্শন-স্পৃহা বল করিয়া উঠে, এই জন্য তখন নির্জন প্রদেশে গিয়া আমরা তাঁহার মনন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; তাঁহার দর্শন-বিরহে তাঁহার চিন্তাই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়। স্পৃহার উদ্দীপন হইলেই চিন্তার প্রয়োজন হয়; এবং সেই চিন্তার প্রগাঢ়তা এবং একাগ্রতাই নিদিধ্যাসন। স্পৃহা এবং যত্নের আধিক্যে চিন্তা যখন একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরকে মনোমধ্যে আহ্বান করে, ঈশ্বর তখন সাধ-কের আত্মাতে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হ'ন। তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের পর শীতল সন্ধ্যা-সমী-রণ যেমন অধিকতর রমণীয়, গ্রীষ্মের পরে দেবতার বর্ষণ যেমন অধিকতর রমণীয়, সেই-রূপ পরমাত্মার সহবাস তখন ভক্তের হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠে। তখন ভক্তের কত না আনন্দ; তিনি তখন ধন্য ধন্য হইয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বরের চরণে প্রণত হ'ন, পুনর্ব্বার তিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখেন, পুনর্ব্বার তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হয়—তাঁহার মনের গুপ্ত কপাট সকল উদ্ঘাটিত হইয়া সর্ব্বত্র মুক্ত সমীরণ যাতায়াত করিতে থাকে—তাঁহার শরীরে স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহার জীবন জন্মের মত কৃতকৃতার্থ হয়।

হে পরমাত্মন্! "আবিরাবীর্ম্মএধি" তৃষিত হৃদয়ে আমরা তোমাকে ডাকিতেছি তুমি আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। তো-

মার চরণে প্রনিপাত করিয়া আমরা জীবনকে সার্থক করিব তুমি আমাদের নিকট আবির্ভূত হও! হে ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন—তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও! তোমার মধ্যে আমাদের মধ্যে যেন মোহ-ব্যবধান না থাকে; তোমার দর্শন-লাভের জন্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি, তুমি তোমার প্রসাদ-বারি বিতরণ করিয়া আমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

সকল জ্ঞানের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের সমান আবশ্যকতা।

কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, এই তন্ত্রের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য—অবশ্যম্ভাবী নিয়ম-সকলকে ওরূপ প্রভূত ব্যাপ্তি-শীল করিয়া দাঁড় করানো কি একান্তই আবশ্যক? আর আর জ্ঞানের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া শুদ্ধ যদি কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের সম্বন্ধে ঐ-সকল নিয়মের আধিপত্য সপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাই কি এখানকার পক্ষে যথেষ্ট নহে? তাহা যদি যথেষ্ট হয়, তবে সর্ব্ব-সাধারণতঃ সকল জ্ঞানের স্কন্ধে ও-সকল নিয়ম চাপাইতে না যাওয়াই তো ভাল। কিন্তু, ভ্রাতঃ, তাহা যথেষ্ট নহে। আমাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য এটি সংস্থাপন করা নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যক (অতীব স্পষ্টাক্ষরে এটি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে) নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যক যে, একা কেবল মনুষ্যের জ্ঞান নহে কিন্তু সকল জ্ঞানই—জ্ঞান-মাত্রই—ঐ সকল নিয়মের বশতাপন্ন। এ জন্য উপরে যে ইঙ্গিত-টি প্রক্ষিপ্ত হইল (কি না—শুদ্ধ কেবল মনুষ্য-জ্ঞানেরই কথা কহা হউক্) এ তন্ত্র তাহাতে সম্মত হইতে পারে না। তবুও যদি এখানকার এই পদ্ধতির বৈধতা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের ভিতর কোন প্রকার ধোঁকা থাকে, তবে আমরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিই যে, প্রতিপক্ষ-বিঘাতের নিয়ম—যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি—তাহা সকল-জ্ঞানের পক্ষেই একান্ত অলঙ্ঘনীয় কি না—এ বিষয়ে তিনি আপনি কি বলেন তাহা একবার স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখুন। মানুষিকই হউক্ আর অমানুষিকই হউক্—কোন জ্ঞানই কি দুই বিপরীত বাক্যের উভয়কেই সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে পারে? তিনি আপনিই বলিবেন—কখনই না। তবেই হইতেছে যে, প্রতিপক্ষ-বিঘাতের নিয়ম সকল-জ্ঞানের পক্ষেই নির্বিশেষে বলবৎ। সর্ব্বসাধারণতঃ সকল জ্ঞানের সম্বন্ধে আমরা যদি একটি-কোনো নিয়মের (যেমন ঐ নিয়ম-টির) বলবত্তা সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলেই তো সমস্ত বিবাদ মিটিয়া গেল, ও আমাদের পক্ষই স্থির-তর রহিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমাদের এই তন্ত্র পূর্ব্বাহ্লেই এটি কিছু-আর মানিয়া লয় না যে, মনুষ্য-জ্ঞান ছাড়া আর-কোন প্রকার জ্ঞান আছে। এ তন্ত্রের কার্য্যারম্ভের পক্ষে ওরূপ মানিয়া লওয়া আবশ্যকই হয় না—সুতরাং উহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তা বলিয়া—এ তন্ত্র এ কথাটি বলিতে ছাড়ে না যে, মনুষ্য-জ্ঞান ব্যতীত যদি (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর-কোন প্রকার জ্ঞান থাকে, তবে তাহা ঐ-সকল নিয়মের বশবর্ত্তী ভিন্ন আর-কিছু হইতে পারে না; কারণ, ও-সকল নিয়ম জ্ঞান-মাত্রেরই, এবং চিন্তা-মাত্রেরই, সম্ভাব্য-

তার নিদান; উঁহাদিগকে ছাড়িয়া জ্ঞানও সম্ভব হয় না, চিন্তাও সম্ভব হয় না।

অসঙ্গতি-দোষের দায় অতিক্রমণ।

এই তন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আর-একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত বিষয়কে মনুষ্য-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিয়া প্রতিপন্ন করাতে—এ তন্ত্র-টি অসঙ্গতি-দোষে লিপ্ত হইয়াছে। এ তন্ত্র ও-রূপ কোন দোষেই লিপ্ত নহে। এ তন্ত্র বলে এই যে, মনুষ্যের বুদ্ধি এটি বেস্ বুঝিতে পারে যে, অনেক বিষয় যাহা তাহার নিজের অগম্য, তাহা আর-কোন উচ্চতর বুদ্ধির গম্য হইলেও হইতে পারে; এজন্য সে-সকল বিষয় যে, একান্তই বুদ্ধির অগম্য, স্বরূপতই বুদ্ধির অগম্য, তাহা নহে; তবে কি না, ওরূপ উচ্চতর বুদ্ধি—যদি থাকে; কারণ, তাহা যে—আছেই আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত আগে ভাগে মানিয়া লওয়া এখানকার অভিপ্রেত নহে। ও-সকল বিষয়, আমাদের নিজ-বুদ্ধির, যদিও অগম্য, তথাপি উঁহারা বোধগম্যের কোটায় স্থান পাইবার উপযুক্ত। আমাদের এই তন্ত্রের মতে—বোধগম্য-কোটার ভিতর দুইটি কুটুরি;—প্রথম, আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য; দ্বিতীয়, আমাদের আপনাদের বুদ্ধির অগম্য হইয়াও (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর কোন-না-কোন বুদ্ধির গম্য। এই দ্বিতীয় কুটুরির সামগ্রী-গুলিকে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, তাহারা বোধগম্য,—আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য না হউক্—যথাযোগ্য বুদ্ধির গম্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বোধ-গম্য কোটার অভ্যন্তরে কুটুরি যদিচ দুইটি, কিন্তু কোটা-সে একটি মাত্র। বোধগম্য-কোটার প্রতিদ্বন্দ্বী কোটা, যাহা তাহা হইতে পৃথক্‌রূপে বিবেচ্য, তাহা শুধু কেবল আমাদের আপনাদের বোধাতীত হইয়াই ক্ষান্ত নহে—তাহা একান্তই বোধাতীত—স্বরূপতই বোধাতীত; একান্ত বোধাতীতের আর-এক নাম স্ববিরোধী বা অসঙ্গত।

অসঙ্গতি-দোষ আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ-দিগের

অসঙ্গতি দোষ যে, আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষদিগের, তাহার প্রমাণ এই যে, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের মধ্যে সচরাচর যেরূপ দার্শনিক বৈলক্ষণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এমনি এক সৃষ্টি-ছাড়া ব্যাপার যে, তাহা নৈয়ায়িক শ্রেণী-বিভাগের কোন নিয়মেরই প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, ও তাহার উৎপীড়নে দর্শন-শাস্ত্র এ-যাবৎকাল মরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছে দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে (বস্তু-শব্দ এখানে অতীব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়-মাত্রই এখানে বস্তু) দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; যে সকল বস্তু আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তাহারা একদিকে (এই সকল বস্তুকেই প্রকৃত রূপে চিন্তনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে), আর, যে-সকল বস্তু আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় না হইয়াও অন্য কাহারো-না-কাহারো চিন্তনীয়—ইহারা একদিকে; তাহার মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীকে তাঁহারা একেবারেই অচিন্তনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা একবার দেখ;—যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় তাহা ঐকান্তিক অচিন্তনীয়ের কোটায়—অর্থাৎ স্ববিরোধী এবং অর্থ-শূন্যের কোটায়—আটক পড়িয়া যাইতেছে। এটা নিঃসংশয় যে, আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় কিন্তু আর কাহারো চিন্তনীয় এরূপ তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তত্ত্বের বরং কত-

কটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে স্ববিরোধী তত্ত্বের আদবেই কোন সম্পর্ক নাই; হইলে হইবে কি—আমাদের তত্ত্বজ্ঞ ভ্রাতারা সে-দিকে আদবেই দৃক্‌পাত করেন না। তাঁহারা, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয়, এ দুয়ের মধ্যে এমনি এক লক্ষণ-ভেদ আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন যে, তাহাকে লক্ষণ-ভেদ না বলিয়া লক্ষণ-সঙ্কর বলিলেই ঠিক্ হয়; এই ভ্রম-সিদ্ধান্ত-টি দর্শন-শাস্ত্রকে নিতান্তই বিপদে ফেলিয়াছে, এমন কি কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেও ত্রুটি করে নাই।

লক্ষণ-সংকরের উদাহরণ।

মনে কর, কোন প্রকৃতিতত্ত্ব-বিৎ—ভারাত্মক এবং ভারহীন—এই দুই প্রকার বস্তুর বিবেচনা কালে,ভারাত্মক বস্তু সকলকে নিম্নলিখিত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন;—(১) যাহা আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক তোলনীয় (এই প্রকার বস্তুকেই তিনি প্রকৃত পক্ষে ভারাত্মক বলিয়া ধার্য্য করিলেন); (২) যাহা তোলনীয় বটে কিন্তু আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক নহে; আর মনে কর যে, শেষোক্ত প্রকার বস্তু সকলকে তিনি নির্ব্বিশেষে ভার-হীন নামে সংজ্ঞিত করিলেন। তাহা যদি হয়, তবে হিমালয় ভার-হীন, যে-হেতু তাহা আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক অতোলনীয়; অথবা—যাহা একই কথা—হিমালয় আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক অতোলনীয় অতএব তাহা স্বরূপতঃ অতোলনীয়। জগতে, স্বরূপতঃ অতোলনীয় কিছুই যে, নাই, তাহা মনে করিও না;—যদিচ তাহা প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বড় একটা গ্রাহ্যে আনে না। সোম মঙ্গল প্রভৃতি বার-সকল স্বরূপতই অতোলনীয়। অতএব ফলে দাঁড়াইতেছে এই—যে, ঐ সকল অবস্তু—যাহাদিগকে আমরা সোম মঙ্গল বুধ প্রভৃতি নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি—হিমালয় তাহাদের অপেক্ষা একটুও বেশী ভারাত্মক নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ-দুয়ের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতেরা যে-প্রকার প্রভেদ অবধারণ করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক্ ঐরূপ। প্রকৃতি-বিজ্ঞান যদি এইপ্রকার অদ্ভুত শ্রেণী বিভাগ-কার্য্যে সাধারণতঃ রত হইত, তবে তাহা আজ কোথায় থাকিত? দর্শন-শাস্ত্র এখন যেখানে আছে—উহা সেইখানে থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত তত্ত্ব চিন্তার নিয়ম সকলকে বাল্য-ক্রীড়ায় পরিণত করিয়াছে।

এই সব গোলমালের গতিকে, চিন্তার নিয়ম-সকল তত্ত্বানুশীলকদিগের নিকট এক-প্রকার খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয়, তাহার সহিত ঐকান্তিক অচিন্তনীয় ব্যাপার-সকলকে একসঙ্গে জড়াইয়া তাঁহারা বলেন এই যে, এমন অনেক বিষয় আছে যাহারা একান্ত-পক্ষেই অভাবনীয়, অথচ এ-টি আমাদের না ভাবিলেই নয় যে, তাহারা আছে; অর্থাৎ কি না—এ সব তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে—চিন্তার নিয়মানুসারে যে-বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে না, তাহার অস্তিত্ব আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে। তাঁহারা আমাদিগকে এমনি একটি বিষয় ভাবিতে বলেন, যাহা তাঁহারা পরক্ষণেই বলেন যে, তাহা ভাবনার অতীত। এক কথায়, যাহা "ভাবিতে পারা যায় না" বলেন, তাহাই ভাবিতে বলেন। ইহার অর্থ—চিন্তার নিয়ম-সকলকে লইয়া বাল্য-ক্রীড়া—সমস্ত শাস্ত্রটাকে লইয়া কৌতুক-পরিহাস—এ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহার একটি দৃষ্টান্ত;—এই একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, আমরা আমাদের আপনাদের সম্বন্ধ-বহির্ভূত কোন কিছুই ভাবিতে পারি না; কিন্তু এই কথাটির ধ্বনি

অবসান হইতে না হইতেই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, আমাদের আপনাদের সম্বন্ধ-বহির্ভূত বস্তু আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে এবং তাহা আমরা ভাবিয়া থাকি। ইহার ভিতর অবশ্যই কিছু-না-কিছু গলদ্ আছে। হয় বলো—নিয়ম যাহা নির্দ্ধারিত হইল তাহা নিয়মই নহে, নয় বলো যদি তাহা নিয়মই হইল তবে তাহার বন্ধন ছেদন করিয়া আমরা কোন কিছুই ভাবিতে সমর্থ নহি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা আপনাদের কথার বন্ধনে শক্তাশক্তি-রূপে ধরা-বাঁধা দিতে পারৎপক্ষে স্বীকৃত হ'ন না; আপনাদের কথাকে তাঁহারা আপনারা বড়ই ডরা'ন; আপনাদের কথার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেই তাঁহারা সবিশেষ তৎপর।

তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অসঙ্গতি-দোষ অপ্রতীকার্য্য।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ঐ-যে গোলযোগ বা লক্ষণ-সংকর যাহার কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলা হইল, তাহার প্রতীকারের পথ আছে। উহার প্রতীকারের পথ একটিও নাই। তত্ত্বজ্ঞানী বলিতে পারেন যে, "ঐকান্তিক অচিন্তনীয়" এই যে, একটি কথা, ইহার অর্থ শুধু কেবল আমাদের আপনাদের কর্ত্তৃক অচিন্তনীয়," তাহার অধিক আর কিছুই নহে। "ঐকান্তিক অচিন্তনীয়" শব্দের এ যা অর্থ করা হইল—ইহাতে দাঁড়াইতেছে যে, তাহা "ঐকান্তিক অচিন্তনীয়" নয়—তাহা শুধু কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয়; এরূপ-বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা ভাবিতে না পারিব কেন—স্বচ্ছন্দে আমরা তাহা ভাবিতে পারি। যাহা সত্যসত্যই ঐকান্তিক অচিন্তনীয়, এক কথায়—যাহা স্ববিরোধী, তাহারই অস্তিত্ব আমরা ভাবিতে পারি না; কিন্তু যাহা স্ববিরোধী নহে তাহার অস্তিত্ব আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আপনাদের জ্ঞান-গোচর বলিয়া) না-ও যদি ভাবিতে পারি, তবুও তাহা আমরা পরোক্ষ-সম্বন্ধে (অর্থাৎ অন্যের জ্ঞান-গোচর বলিয়া) অনায়াসে ভাবিতে পারি। কিন্তু ঐকান্তিক অচিন্তনীয় এবং আমাদের আপনাদের-কর্ত্তৃক অচিন্তনীয় এ দুইটি পৃথক্ লক্ষণাক্রান্ত বিষয়কে এক করিয়া ফেলা কি বৈধ কার্য্য? উভয়ের মধ্যে স্পষ্টই যখন লক্ষণ-ভেদ রহিয়াছে, আর সে লক্ষণ-ভেদ যখন অর্থ-পূর্ণ, তখন সে বাঁধ-টি ভাঙিয়া ফেলিয়া ভাষা এবং ভাবকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবার অর্থ কি? যাহা আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় হইয়াও অন্যের চিন্তনীয়, তাহা তো চিন্তনীয়ের কোটাতেই স্থান পাইবার উপযুক্ত; কারণ কোন-একটি বস্তু যদি কোন সূত্রে চিন্তনীয় হয় (তাহাকে আমরা অন্যের চিন্তনীয় বলিয়া চিন্তা করিতে পারি—এ সূত্রেও যদি তাহা আমাদের চিন্তনীয় হয়) তবে সেই সূত্রে তাহা চিন্তনীয়ের কোটায় অবশ্যই স্থান পাইতে পারে। ঐকান্তিক অচিন্তনীয়ই প্রকৃতরূপে অচিন্তনীয় এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাহার আর এক নাম স্ববিরোধী।

চিন্তার নিয়ম কল্পনার নিয়মে পরিণত।

পুনশ্চ "যে বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে না, তাহা ভাবিতেই হইবে" এ কথাটির অসঙ্গতি-দোষ যখন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানী যেরূপে স্বপক্ষ-সমর্থন করেন তাহা এই;—তাঁহাকে যখন খুব কসাকসি করিয়া ধরা যায়, তখন তিনি এই বলেন যে, "যাহা ভাবনা করা যায় না" এই যে কথা বলা হইল, এইখানেই ভাবনা-শব্দের অর্থ প্রকৃত পক্ষেই ভাবনা, কিন্তু তাহার পরে এই যে-কথাটি বলা হইল যে "তাহা ভাবিতেই হইবে," এখানে ভাবনা শব্দের অর্থ—কল্পনা, মনোনেত্রের সমক্ষে ছবি খাড়া করা। তাঁহার এই সম্মতি-

বাক্যটি তাঁহার পক্ষের নূতন একটি অবয়ব আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছে; পূর্ব্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, চিন্তার নিয়ম-সকলের নিগূঢ় মর্ম্ম বিবৃত করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, এখন দেখিতেছি—তাহা নহে, শুধু কেবল কল্পনার নিয়ম-সকলের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এটি যদি পূর্ব্বাহ্নে আমাদিগকে বুঝাইয়া বলা হইত, তাহা হইলে কোন বাদানুবাদেরই প্রয়োজন হইত না, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের সকল কথাই আমরা নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিতাম। কিন্তু, না আদিতে, না অন্তে, কোথাও তাহা বুঝাইয়া বলা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানী আগা গোড়া বলিয়া আসিতেছেন যে, তিনি—কল্পনার নহে কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির—মনোরথের নহে কিন্তু চিন্তার—নিয়ম-সকল বিবৃত করিতেছেন; অতএব, হয় তাঁহার সূচনা-পত্র স্ববিরোধী, নয় বিভ্রান্ত, নয় যাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইবেন বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে না দেখাইয়া, ভিন্ন আর একটা কিছু—যাহা আমরা দেখিতে চাই না—তাহাই আমাদিগকে দেখাইতেছেন। ইহা আমাদিগকে শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই যে, যাহা আমাদের কল্পনার অতীত তাহা আমাদের চিন্তার গম্য হইতেও পারে। এই সহজ সত্যটিকে আমরা অখণ্ডনীয়-বোধে নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিতেছি। কিন্তু ইহাঁদের মুখে যখন আমরা শুনি যে, যাহা আমরা আদবেই ভাবিতে পারি না—তাহা আছে ইহা আমরা ভাবিতে পারি, ইহা শুনিবামাত্র আমাদের জ্ঞান স্ববিঘাতের সংক্ষোভে সচকিত হইয়া উঠে। বিশেষ কোন মনোবিজ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা বলা হইতেছে না; এ-সকল কথা সকল-মনোবিজ্ঞানীর সম্বন্ধেই খাটে; আমাদের কথার লক্ষ্য সমস্ত তন্ত্রটার প্রতি যত—বিশেষ বিশেষ তন্ত্রকারদিগের প্রতি তত নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের লক্ষণ-সংকর ঘটাইবার অপরাধে কে প্রধানতঃ দায়ী ইহা বলা সুকঠিন।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম-সকলকে লইয়া বাল্য-ক্রীড়া করে না।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম সকলকে লইয়া বাল্য-ক্রীড়া করে না। এ তন্ত্র যাহা মনে ভাবে তাহাই মুখে বলে, এবং যাহা বলে তাহাতেই টেঁকিয়া থাকে। এ তন্ত্র "যাহা ভাবিতে পারা যায় না" বলে, তাহা ভাবিতে পারা যায়ই না বলে। আমাদের লোক-রঞ্জক মনোবিজ্ঞানের ন্যায় এ তন্ত্র আপনার কোন সিদ্ধান্তের ল্যাজাকে দিয়া তাহার মুড়া ভক্ষণ করায় না। এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম-সকলকে এরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করে না যে, লজ্জিত হইবার জন্যই যেন তাহাদের থাকা, প্রত্যুত এইরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করে যে, সর্ব্বত্র বলবৎ হইবার জন্যই তাহাদের থাকা। ইহা এইরূপ শিক্ষা দেয় যে, বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব অনুসারেই মনুষ্য ভাবিতে পারে, মনোবিজ্ঞানের ন্যায় এ-রূপ শিক্ষা দেয় না যে, বুদ্ধির মূলতত্ত্বের বিরুদ্ধেও মনুষ্য ভাবিতে পারে এবং ভাবে। এ তন্ত্রের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যাহা সে বলিবে—তাহাতেই আবদ্ধ থাকিবে।

এ তন্ত্র বাদানুবাদের গোড়ার সূত্র-সকলকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনে।

আর-আর তন্ত্র-সকল অনেক বিষয়েই পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে। আমাদের এইটি ধারণা যে, বর্ত্তমান তন্ত্র সকল-বিষয়েই অখণ্ডনীয়। এ তন্ত্রের মধ্যে একান্ত পক্ষেই যদি খণ্ডন-যোগ্য কিছু থাকে, তবে সে-টি এই তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত। একটি-মাত্র লক্ষ্য-স্থানের প্রতি সমস্ত প্রতিবাদের

শর-সন্ধান করিতে পারা—তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কম সুবিধার কথা নহে। এ তন্ত্র আপনার আর আর সিদ্ধান্ত-গুলিকেও যেমন—মূল সিদ্ধান্তটিকেও তেমনি—অখণ্ডনীয় বলিয়া জানে; কিন্তু ইহার প্রতি যদি-বা কাহারো কোন-প্রকার সন্দেহ থাকে, তথাপি এ-বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, ঐ মূল সিদ্ধান্তটিই এক যা কেবল বিবাদ-স্থল। এই জন্য এ তন্ত্র—দার্শনিক বাদানুবাদের মূল-সূত্র সকলকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে বলিয়া—তাহাদিগকে একেবারেই উন্মূলিত না করুক্ অতীব অল্পের মধ্যে সংকুচিত করিয়াছে বলিয়া—বিনীত-ভাবে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করে।

উপক্রমণিকার উপসংহার।

বর্ত্তমান তন্ত্র কেমন করিয়া মূলে (অর্থাৎ নিতান্ত গোড়ার কথায়) পৌঁছিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদর্শন করিয়া এই উপক্রমণিকা সাঙ্গ করা যাইতেছে। কারণ, মূল কথাটিতে কেমন করিয়া পৌঁছানো হইয়াছে—এ-টি বুঝিতে পারিলেই মূল-কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ফলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঐটি যতক্ষণ না বুঝিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ হয় তো মূল-কথাটি তাঁহার নিকট যদৃচ্ছা-সম্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইবে, হয় তো তাঁহার মনে এইরূপ একটা ধোঁকা থাকিয়া যাইবে যে, মূল কথাটি যথোক্ত-বিধ না হইয়া অন্য-বিধ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কেমন করিয়া ঐ মূল-কথাটিতে পৌঁছানো হইয়াছে, ইহা যখন তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন, তখন তাঁহার সমস্ত সংশয় তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া যাইবে; তখন তিনি দেখিবেন যে, গোড়ার কথা উহা-ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

মূলে উত্তীর্ণ হইবার পদ্ধতি।

পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে—জ্ঞানতত্ত্বই এ সংহিতার প্রথম খণ্ড; অর্থাৎ প্রথমেই উহাকে জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার চরম সীমায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এই খণ্ডের যেটি আদ্যন্ত-ব্যাপী সর্ব্বময় প্রশ্ন, সেটি এই যে, জ্ঞান কি? কিন্তু এ প্রশ্নটি, ইহার বর্ত্তমান আকারে, অতিশয় ভ্রান্তিজনক, দুরায়ত্ত, এবং দুর্ব্বোধ্য। আমরা উহাকে ধরিতে ছুঁতে পাই না। কোথায় যে উহার মুষ্টি-স্থান তাহার ঠিকানা পাই না। উহাতে ছোটো বা বড় কোন-প্রকার ব্যক্ত অবয়ব নাই। এই সূতার পুঁটুলির আরম্ভ স্থান কোথায়—'থাই' কোথায়? ইহা কি সূতার পুঁটুলি, না পাথরের গোলা? কারণ, যদি পাথরের গোলা হয়, তবে ইহার জটা ছাড়াইতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। কামানের গোলার জটা ছাড়ানো মনুষ্যের অঙ্গুলীর কর্ম্ম নহে। তা নয়—ইহা সূতার-ই পুঁটুলি; তবে কি না—ইহার থাই খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন; তাহা যে-পর্য্যন্ত না খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে সে-পর্য্যন্ত পুঁটুলিটির জটা ছাড়ানো অসাধ্য ব্যাপার। আর কিছু হউক্ আর না হউক্, এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, ঐ পুঁটুলির উপর আর যেন পুঁটুলি জড়ানো না হয়;—এ বিষয়টিতে লোকের মনোযোগ অতি অল্প ইহা আমরা পূর্ব্বে একস্থানে ইঙ্গিত করিয়াছি। অলঙ্কার ছাড়িয়া সাদা কথায়;—যদিচ আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, জ্ঞান কি—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা, তথাপি, জ্ঞান কি—এই অস্পষ্ট, গোল-মেলে, এবং ব্যাপক প্রশ্নের মধ্যে গোড়ার কথা কি, তাহা খুঁজিয়া পাইতে এখনো অবশিষ্ট আছে। জ্ঞান কি—এই প্রশ্নটিকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া বিভাগ করা কঠিন নহে, পরন্তু সেই খণ্ডাংশ-গুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত-পক্ষে মূলাংশ—অর্থাৎ গোড়ার কথা—তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

প্লেটো গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই।

প্লেটোর সক্রেটিস্‌ ঐ কাঠিন্যে আটক পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার মধ্যে কোন্‌ খানটা যে কঠিন, তাহা সক্রেটিস্‌ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মীমাংসা যে কিরূপে হইতে পারে তাহা তিনি দেখিতে পা'ন নাই, অন্ততঃ তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন "জ্ঞান কি?" শিষ্য উত্তর করিলেন "জ্যামিতি এবং আর আর বিষয় যাহা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলা-কহা করিতেছি, তাহাই জ্ঞান।" ইহার উত্তরে সক্রেটিস্‌ যাহা বলিলেন তাহা দিব্য লগ্ন-সঙ্গত ও ঠিক্‌ সক্রেটিসেরই মতো—যদিচ তাহা ফলদায়ক নহে। সক্রেটিস্‌ বলিলেন "খুব বদান্যতা-সহকারে, খুব মুক্ত-হস্তে, বলিতে কি —রাজা-রাজড়ার মতো, তুমি উত্তর প্রদান করিলে। শুদ্ধ কেবল একটি বস্তু আমি তোমার নিকট যাচ্ঞা করিলাম—তুমি কত না বস্তু আমাকে প্রদান করিলে। আর, আমার মতো একজন বুড়া মুর্খের প্রতি তোমার এই যে উদার আচরণ, এ-কেই আমি বলি প্রকৃত মহত্ত্ব।" এই মিষ্ট ভৎর্সনায় শিষ্য কিছু অপ্রতিভ হইলেন; তখন সক্রেটিস্‌ আপনার মর্ম্ম কথাটি খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন "আমার মর্ম্মটি যে কি তাহা তুমি ধরিতে পার নাই; জ্ঞানের বিষয় কি কি তাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, জ্ঞান স্বয়ং কি—ইহাই কেবল আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" এই ব্যাখ্যাটি যদিও ঠিক্‌ লক্ষ্য-স্থানটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে—তথাপি ইহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিতেছে না; কারণ, এদিকে যখন—গুরুশিষ্যে মিলিয়া জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির যত কাছ ঘেঁসিয়া পারেন (খুব যে বেশী কাছ ঘেঁসিয়া তাহা নহে) তর্ক বিতর্ক চালাইতেছেন, ওদিকে তখন—প্রশ্নটি মাঝে-হইতে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় পৃথিবী-গর্ব্ভে তলাইয়া গিয়াছে; পুনর্ব্বার যদিও তাহা সময়ে সময়ে প্লেটোর প্রবন্ধ-মধ্যে দেখা দিতে উঠিয়াছে কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্য—অল্প একটু ইসারায় দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ অমনি পাতালে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। প্লেটো তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা খুঁজিয়া পা'ন নাই—অন্ততঃ কোথাও তাহার প্রকাশ নাই।

গোড়ার কথার অনুসন্ধান।

অতএব জ্ঞান কি—এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের আপনাদের দ্বারা কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক্‌। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—ঐ প্রশ্নটিরই মীমাংসা এই সংহিতার প্রথম খণ্ডের মুখ্য কার্য্য। তবে কেন উহাতে আমরা একেবারেই কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত না হই। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, যদি উহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিয়াই গ্রন্থের গোড়া পত্তন করা শ্রেয়—ইহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ যাহা আমাদের হস্তাভ্যন্তরে আছে তাহাকে দিয়াই আপাততঃ কার্য্য চালাইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা যদি করা যায় তবে তত্ত্ব-জ্ঞান একটি যদৃচ্ছা-মূলক কাণ্ড হইয়া উঠে; তাহা এমনি একটি তন্ত্র হইয়া উঠে যাহার মূল-পত্তন অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী নহে—কেবল তত্ত্বালোচকের সুবিধা এবং স্বেচ্ছার অনুবর্ত্তী এরূপ ঘটনা তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্য এবং মাহাত্ম্যের পক্ষে নিতান্তই হানিজনক। উহা

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ-সকলের বিশেষত্ব নষ্ট করে—তাহাদের মর্য্যাদা অপহরণ করে—তাহাদের বাহ্য অবয়ব হইতে তাহাদের প্রাণকে বিযুক্ত করে। অতএব জ্ঞান কি—এ প্রশ্নকে আপাততঃ ঠেলিয়া রাখিবার মুখ্য কারণ তাহার জটিলতা নহে, আর, নূতন একটা প্রশ্ন খুঁজিয়া আনিবার জন্য আমরা যে ব্যগ্র হইতেছি, তাহার মুখ্য কারণ তাহার সহজ-গম্যতা নহে। অবশ্য, পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষাকৃত জটিল, এবং শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত সহজ হইবারই কথা। কিন্তু সে বিবেচনা গৌণ কল্প; সে বিবেচনায় আমরা পূর্ব্ব-প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া রাখিতে এবং নূতন একটা প্রশ্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে অগত্যা বাধ্য নহি। স্বেচ্ছা এবং সুবিধার গতিকে নহে কিন্তু, অগত্যা, যদি না আমরা ঐরূপ করিতে বাধ্য হই, তবে আমাদের কার্য্য-পদ্ধতি যদৃচ্ছা-মূলক হইবে। কিন্তু যদি আমাদের এই তত্ত্বজ্ঞানকে যথার্থ সত্য বলিয়া প্রতিপাদন এবং গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাকে ওরূপ হইতে-দেওয়া হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই এমন কোন বস্তুকে সত্য বলিতে অধিকারী নহে, যাহাকে সত্য বলিয়া না-ভাবিলেও না-ভাবা যাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে কেহই এমন একটিও পদ্ধতি অবলম্বন করিতে অধিকারী নহে—যাহার পরিবর্ত্তে আর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও করা যাইতে পারে।

জ্ঞান কি এইটিই গোড়ার প্রশ্ন হইতে না পারে কেন?

কেন তবে আমরা—জ্ঞান কি—এই প্রশ্ন একেবারেই হস্তে লইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না? এই তাহার যথেষ্ট কারণ যে, প্রশ্নটি বোধগম্য নহে। ঐ প্রশ্নটি এখন যে আকারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার অতীব অস্পষ্ট ভিন্ন আর কোন প্রকার অর্থ কাহারো বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতে পারে না। উহা দ্ব্যর্থ-লক্ষণাক্রান্ত; উহার অর্থ একাধিক; এই জন্য উহার বর্ত্তমান আকারে উহা কাহারো বোধ-গম্য হইবার নহে। কাজেই উহা হইতে আমাদিগকে অগত্যা ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে; কারণ, যাহা বুঝা যায় না—তাহা লইয়া কিছু-আর আন্দোলন চলিতে পারে না। অতএব ঐ প্রশ্নটিকে আপাততঃ পরিত্যাগ করা আমাদের স্বেচ্ছার কার্য্য নহে—তাহা নিতান্তই অনিবার্য্য। তেমনি আবার, তাহার স্থলে নূতন একটি প্রশ্নের অবতারণা শুধু-যে-কেবল আমাদের সুবিধার জন্য করা—তাহা নহে; তাহা না করিলে নয় বলিয়াই তাহা করা। তাহা শুধু-যে কেবল আমাদের প্রার্থনীয় তাহা নহে, তাহা একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। দর্শন-শাস্ত্রকে ফলোপধায়ী হইতে হইলে তাহার যেমনটি হওয়া চাই, আমাদের আলোচনা-পদ্ধতি ঠিক্ সেইরূপ; তাহার কোন-স্থানে স্বেচ্ছা-মূলক কিছুই নাই—তাহা আদ্যোপান্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী।

ঐ প্রশ্নের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যে প্রশ্ন আমরা অন্বেষণ করিতেছি তাহা—জ্ঞান কি—এই প্রশ্নের সহিত অবশ্যই কোন-না-কোন সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ; কারণ, অস্পষ্টই হউক আর যাহাই হউক—জ্ঞান কি—ইহাই আমাদের প্রথম খণ্ডের মূল প্রশ্ন। নূতন প্রশ্নটি নূতন কিছুই নহে, তাহা ঐ মূল প্রশ্নটিরই—প্রদর্শনের উপযোগী সুস্পষ্ট এবং বোধ-গম্য মূর্ত্ত্যন্তর। স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞানকি—ইহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে; প্রথম অর্থ এই যে, নানা জাতীয় জ্ঞান যে-অংশে পরস্পর হইতে বিভিন্ন, সে অংশে জ্ঞান কি? সহজ কথায়—জ্ঞান কত-প্রকার? দ্বিতীয় অর্থ এই যে, বিভিন্ন-জাতীয় যত

প্রকার জ্ঞানই হউক না কেন—সকল জ্ঞানই যে অংশে জ্ঞান বই আর কিছুই নহে, সে অংশে, জ্ঞান কি? সহজ কথায়,—এমন একটি অপরিবর্ত্তনীয় অবয়ব—অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ—বা অপরিবর্ত্তনীয় অংশ—কি আছে, যাহা সাধারণতঃ সকল জ্ঞানেই বর্ত্তমান? জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরের প্রভেদ এখানে মূলেই ধর্ত্তব্য নহে।

ঐ দুই প্রশ্নের কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞান কি—এই দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নটি নিম্নলিখিত দুইটি সহজ-বোধ্য প্রশ্নে বিভক্ত হইল; প্রথম, জ্ঞান কত প্রকার? দ্বিতীয়, সকল জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে এক অভিন্ন অবয়ব কি? এ তো হইল; এখন দেখিতে হইবে—ঐ দুইটি প্রশ্নের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের এখনকার প্রশ্ন—কোন্‌টি জ্ঞান-তত্ত্বের নিকটতম প্রশ্ন? হয় এ-টি—নয় ও-টি—দুয়ের একটি-না-একটি তাহাতে আর ভুল নাই; কেননা তৃতীয় কোন প্রশ্নের সম্ভাবনা নাই। কোন্‌টি তবে আমাদের এখনকার প্রকৃত প্রশ্ন? ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সক্রেটিসের শিষ্য সহসা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, প্রথমটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন। সক্রেটিস্ অচিরে তাঁহার শিষ্যের ভুল ভাঙিয়া দিলেন; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের নিকট আমরা কিছু-আর এ উপদেশের প্রার্থী নহি যে, জ্ঞান—গণিত ইতিহাস ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা-শাখায় বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নটিই তবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন—যদিচ সক্রেটিস সে বিষয়ের কোন আভাস আমাদিগকে প্রদর্শন করেন নাই। এইটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের মূলতম প্রশ্ন—ইহার মূলে আর কিছুই নাই। এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় উত্থান-দ্বার।

তত্ত্বজ্ঞানের একটি উত্থান-দ্বার আছে ইহার প্রমাণ এই যে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—সেটি এই;—আমাদের সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষণ—সাধারণ মধ্য-ভূমি—অটল সংগ্রহ-স্থান বাস্তবিক কিছু আছে কি? আমাদের অনুসন্ধানের ফল কার্য্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহারই উপর এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। যদি ওরূপ কোন সাধারণ মধ্য-ভূমি না থাকে, কিম্বা যদি কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের অস্তিত্বই অসম্ভব; কিন্তু যদি ঐরূপ একটি কেন্দ্র বা সাধারণ লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব না হয় এবং তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞান নির্ব্বিঘ্নে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহার মূল প্রশ্নের উত্তর হইতে যতকিছু ফল দোহন করিবার আছে তাহা দোহন করিয়া আপনার ভাণ্ডার যথেচ্ছা পূরণ করিতে পারে। জ্ঞানের ঐরূপ একটি কেন্দ্রস্থান আছে ইহার প্রমাণ এই যে, ঐরূপ একটি কেন্দ্রস্থান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানের উত্থান দ্বার।

আমাদের সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত সাধারণ কেন্দ্র, সাধারণ লক্ষণ, বা সাধারণ অবয়ব অবশ্য এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান—যাহা জ্ঞান-মাত্রেরই পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। অথবা যাহা একই কথা—তাহা এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান যে, যে-কোন জ্ঞানই হউক না কেন—সে জ্ঞান হইতে সে উপাদানটি অপহৃত হইলেই সে জ্ঞানের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি অলঙ্ঘনীয়, এবং যে পর্য্যন্ত না সেই অপহৃত উপাদানটি তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার পুনরুদ্দীপন একান্তই অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ ঐ-যে মূল-উপাদান—যাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ একান্ত অবশ্যম্ভাবী) হইতেই হইবে, কেননা সেরূপ না

হইলে তাহা বর্ত্তমান সংহিতার ন্যায় এরূপ একটি কঠোর যুক্তিযুক্ত তন্ত্রের কোন কার্য্যেই আসিবে না, সেরূপ না হইলে তাহা সকল জ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় কেন্দ্র-স্থান দাঁড়াইবে না। পরীক্ষা আমাদের মূল-সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যের পোষকতা করিতে পারে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানই তাহার যাথার্থ্য সংস্থাপন করিতে পারে।

মূল প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি।

তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন, নিকটতম প্রশ্ন, তবে এই;—অশেষ বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন একটি অবয়ব কি, যাহা একমাত্র অদ্বিতীয়, অপরিবর্ত্তনীয়, এবং যাহাকে ছাড়িয়া জ্ঞান হইতেই পারে না। এমন-একটি মুখ্য উপাদান কি আছে যাহা জ্ঞানের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত থাকে; সকল জ্ঞানের অন্তর্নিহিত একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্ব কি?

এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উত্থান-দ্বার এবং তাহা লইয়াই এই সংহিতার প্রথম সিদ্ধান্ত।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন; এবং প্রথম প্রশ্ন তা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; আর, এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উত্থান-দ্বার। প্রথম সিদ্ধান্তে সেই উত্তরটি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহাতেই প্রথম সিদ্ধান্তের উৎপত্তি এবং পর্য্যবসান।

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

সমাজ সংস্কার।

স্থিতি ও গতি সমাজের প্রাণ। যে সমাজের স্থিতি আছে গতি নাই অথবা কেবলই গতি আছে স্থিতি নাই তাহার মঙ্গল হয় না। ফলত যে সমাজ উন্নতি কামনা করে তাহার পক্ষে স্থিতি ও গতি উভয়ই অপরিহার্য্য। অনেকে বলেন এখন হিন্দুসমাজ স্থিতিশীল সুতরাং ইহা মৃত। বাস্তবিক হিন্দুসমাজের পক্ষে এই দোষ নিতান্ত অমূলক নহে। বহুদিন হইতে দেখা যায় যে এই সমাজ সময়োচিত পরিবর্ত্তনের বড় বিরোধী। যদি আর কিছু দিন এই ভাবে চলে তবে ভবিষ্যতে ইহার আর বিশেষ মর্য্যাদা থাকিবে না। কারণ সমাজ মধ্যে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মান্ধাতার সময়ে যে নিয়ম প্রস্তুত হইয়া আছে তাহা দ্বারা এই সমস্ত নূতন নূতন অভাব দূর করা সহজ হয় না। সুতরাং তাহার সময়োচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাহা না হইলে সমাজ টেঁকে না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনও আবার দেশকাল পাত্রানুসারে স্থির ও ধীর ভাবে হওয়া চাই। তদ্দ্বারা সাধারণের সুবিধা কি অসুবিধা দাঁড়ায় তাহার আলোচনা করা চাই। নচেৎ তদ্দ্বারা সমাজের কোন বিশেষ ফল হয় না। ফলত সমাজতত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।

এখন হিন্দুজাতির ভিতর পুত্র কন্যার বিবাহ একটা বিষম বিভ্রাটের কথা দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এক এক বর্ণের মধ্যে অবান্তর বিভাগ। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি কএকটী শ্রেণী। কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণেরও আবার এইরূপ শ্রেণী। এই শ্রেণী-বিভাগ থাকাতে পুত্র কন্যার বিবাহে বিশেষ অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ এখন কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত না করিলে আর চলে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি শাস্ত্রে এইরূপ অবান্তর শ্রেণীর কোন কথা নাই। শাস্ত্রমতে সকল ব্রাহ্মণই এক, সকল শূদ্রই এক। কিন্তু বঙ্গদেশে এই যে অবান্তর বিভাগ ইহা বল্লাল-কৃত। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে রাজা আদিশূর যজ্ঞ সাধনার্থ কান্য-

কুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অযাজ্য-যাজন-দোষে পৈতৃক ভূমিতে আর বসবাস করিতে পারেন নাই। সেই সূত্রে তাঁহাদের গৌড়ে বাস। কালক্রমে ইহাঁদের বিস্তর সন্তান সন্ততি হইয়া উঠে। এই আদিশূরের সম্ভবত ৩০০ শত বৎসর পরে মহারাজ বল্লাল সেন ১০১৯ শকাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি কান্যকুব্জাগত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততিদিগকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের কুলপরম্পরাগত বিদ্যা বিনয়াদি সদ্গুণ অনুসারে কৌলীন্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রেণীবিভাগের মূল দেশভেদে বসবাস। অর্থাৎ যাঁহারা রাঢ় দেশে বাস করিয়া ছিলেন তাঁহারা রাঢ়ীয় এবং যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন। ফলত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এক পিতারই পুত্র। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটু মতভেদও আছে। অনেকে বলেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ অযাজ্য-যাজন-দোষে পৈতৃক ভূমিতে বসবাস করিতে না পারিয়া গৌড়ে অবস্থিতি ও এই স্থানেই বিবাহাদি করেন। সেই সমস্ত বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা রাঢ়দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ীয় হন। আর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পৈতৃক ভূমি কান্যকুব্জে যে সমস্ত সন্তান সন্ততি ছিল কালক্রমে বরেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া বাস করায় তাঁহারাই বারেন্দ্র হন। যাহাই হউক এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহাঁরা যে একই পিতার সন্তান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরও দুই শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরা বৈদিক ও সপ্তশতী। বৈদিক ব্রাহ্মণ দিগের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে যখন দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় কোন রাজা গৌড়দেশ জয় করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার সহিত কতকগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া ছিলেন। আর কতকগুলি পশ্চিম দেশ হইতে আইসেন। এই জন্য ইহাঁদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিভাগ।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে শাস্ত্রে শ্রেণীবিভাগের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের ব্যবস্থাপিত। শাস্ত্রে যখন শ্রেণীবিভাগের কথা নাই তখন পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান কোনও মতে দোষাবহ হইতে পারে না। কারণ সংহিতাই হিন্দুসমাজ শাসন করিয়া আসিতেছে। সেই সংহিতায় আদান প্রদান স্থলে শ্রেণীগত অবান্তর বিভাগের কোন কথা বলে না। এখন বক্তব্য এই হিন্দুসমাজের শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত না বল্লালের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত? শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষায় একটী বিশেষ সুবিধা আছে। শাস্ত্রানুসারে কেবল বঙ্গদেশের নয় ভারতবর্ষের যেখানে যত ব্রাহ্মণ আছে সকলেরই সহিত একটা সম্বন্ধ বন্ধন হইতে পারে। কিন্তু বল্লালের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। কেবল বঙ্গদেশ। তন্মধ্যেও আবার সকল ব্রাহ্মণ সকলের পক্ষে নহেন। এইরূপে ক্ষেত্র প্রশস্ত করা ব্যতীত ইহা দ্বারা আরও একটু উপকার হয়। হিন্দুসমাজ বহুকাল ধরিয়া অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত এই যে বহুকাল ধরিয়া একই দেশের একই বংশের রক্ত-সংস্রবে বংশ ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। এজন্য বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন বংশে আদান প্রদান আবশ্যক। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণাদির অবান্তর শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিয়া সকল দেশের সকল ব্রাহ্মণাদির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে তাহা হইলে এই